ওঁ

অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ।

প্রথম অধ্যায়—ফলাফল বিচার।

উপনিষদ্‌মন্ত্র। "নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ॥"

"আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি এমন মনে করি না। আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনও নহে, জানি যে এমনও নহে। 'আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনো নহে, জানি যে এমনও নহে' এই বাক্যের কর্ম্ম যিনি আমাদের মধ্যে জানেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন।" বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঋষি তলবকার এই গভীর জ্ঞান-গর্ভ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, আমরা ব্রহ্মকে পূর্ণভাবে জানিতে পারি না বটে, কিন্তু একেবারে যে জানিতে পারিব না তাহাও নহে।

ব্রহ্মজ্ঞান লইয়া চিরবিরোধ।

এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান সকলের হৃদয়ে সমান ভাবে প্রস্ফুটিত হয় না। পুরাকালেও সকল ঋষি ব্রহ্মজ্ঞানের এই উচ্চ তত্ত্ব পাইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। আজও যেমন *ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে বিরোধী সম্প্রদায় সকল দেখিতে পাই, সেকালের* ঋষিমুনিদিগেরও মধ্যে সেইরূপ বিরোধী সম্প্রদায় সকল বর্ত্তমান ছিল দেখি। এক সম্প্রদায় ঈশ্বরের অস্তিত্বে, আত্মার অস্তিত্বে এবং পরকালের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন, অপর সম্প্রদায় এই সকল আধ্যাত্মিক বিষয়ে কিছুমাত্র বিশ্বাস করিতেন না। প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের নেতা বৈদিক ঋষি ও মনুপ্রভৃতি ছিলেন; দ্বিতীয়

সম্প্রদায়ের নেতা চার্ব্বাক এবং সম্ভবত বৃহস্পতিও ছিলেন—চার্ব্বাক বৃহস্পতির শিষ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং তিনি দুএকস্থানে স্বমত সমর্থন করিতে গিয়া বৃহস্পতির বচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন।* চার্ব্বাক প্রভৃতি নাস্তিক্যবাদীগণ কিরূপ যুক্তি দ্বারা স্বমত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ জানিবার এখন কোনো উপায় নাই। তবে অন্যান্য সংস্কৃত দর্শন গ্রন্থে তাঁহাদের নাস্তিক্য-

চার্ব্বাক মত।

মতের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ নামক সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থে চার্ব্বাকদর্শনের মত কিঞ্চিৎ বিস্তৃতরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, যেমন চুন ও হলুদ এই দুইটী বিভিন্ন বর্ণের পদার্থ হইলেও তদুভয়ের মিশ্রণে তৃতীয়বর্ণ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ অচেতন পদার্থের সমষ্টি হইতে চেতন আত্মা হওয়াও অসম্ভব নহে। এই বিষয় পরে আলোচিত হইবে সুতরাং এস্থলে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। চার্ব্বাকদর্শনে এতদতিরিক্ত যে সকল কথা আছে, তাহার অধিকাংশই মন্দকর্ম্মের প্রণোদক ও ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অযথা ঈর্ষাপূর্ণ কটূক্তি মাত্র। আশ্চর্য্য এই যে, চার্ব্বাকও মুনিদিগের মধ্যে পরিগণিত হইলেন।

অজ্ঞেয়বাদী।

পুরাকালে যেমন ব্রহ্মবাদী ঋষি ও নাস্তিক্যবাদী পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিবাদ ছিল, এখনও সেইরূপ আস্তিক্যবাদী ও নাস্তিক্যবাদী পণ্ডিতদিগকে যুদ্ধার্থে দণ্ডায়মান দেখিতে পাই। সৌভাগ্যক্রমে নাস্তিক্যবাদের চর্চ্চা ভারত হইতে

---

* প্রসিদ্ধ আছে যে বৃহস্পতি সুরগুরু হইয়াও অসুরদিগকে ভুলাইবার জন্যই নাস্তিকতা প্রচার করিয়াছিলেন। এই কিম্বদন্তী হইতে ঠিক বুঝা যায় না যে বৃহস্পতি প্রকৃত নাস্তিক ছিলেন কি না; নাস্তিকতার ফলে যে অধর্ম্ম প্রচার হয়, তাহা কিন্তু ইহাতে বেশ বুঝান হইয়াছে।

উঠিয়া গিয়াছে। আরও সুখের বিষয় হইত, যদি পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নাস্তিকতারও বহুল প্রচার না হইত। বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্য চিন্তাস্রোতের অনেক নেতা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেন না যে, আত্মা নাই বা ঈশ্বর নাই; কিন্তু তাঁহারা বলেন, যদি বা ঈশ্বর ও আত্মা থাকেন, আমরা তাহা জানি না এবং কিছুতেই জানিতে পারিব না। এই কারণে আমরা তাঁহাদিগকে অজ্ঞেয়বাদী নামে অভিহিত করিব। তাঁহারা নিজেও এই নাম (Agnostic) গ্রহণ করিয়াছেন। আর যাঁহারা আস্তিক্যবাদী, তাঁহাদিগকে আমরা অধ্যাত্মবাদী নামে অভিহিত করিব। অজ্ঞেয়বাদীগণ যে সকল যুক্তিবলে আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান অস্বীকার করেন, তাহা আমরা তাঁহাদের গ্রন্থাদি হইতে সম্মুখেই দেখিতে পাইতেছি, সুতরাং আমরা পুরাকালের নাস্তিক্যবাদ ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমানের অজ্ঞেয়বাদ আলোচনা করিয়া দেখিব।

অধ্যাত্মবাদ ও অজ্ঞেয়বাদ, এই উভয়ের ফলাফল বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

অধ্যাত্মবাদ ও অজ্ঞেয়বাদ, এই দুইটী বিষয় অতীব গুরুতর। এই দুই মত আলোচনা করিবার পূর্ব্বে ইহাদের ফলাফল বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভাল হয়। আমাদের মনের গতি, কর্ম্মের গতি, সকলই এই দুই মতের সত্যাসত্যের উপর নির্ভর করিতেছে; কারণ যেটী সত্য হইবে, আমাদের জীবন তদ্দ্বারা পরিচালিত হইবেই হইবে। সুতরাং আমাদের নিরপেক্ষ ভাবে এই দুই মতের ফলাফল এবং ইহাদের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। ইহাদের সত্যাসত্য বিচার করিবার পূর্ব্বে আমরা কোন মতকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছি না। ফলাফল বিচার করিতে গিয়া আমরা কেবল দেখিব যে, যদি এক ব্যক্তি ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিতে থাকে, তাহারই বা জীবনের অবস্থা

কিরূপ হইবে? আর যদি এক ব্যক্তি ঈশ্বর না মানিয়া, আত্মার অস্তিত্ব ও পরকালের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া সংসারে বিচরণ করে, তাহারই বা জীবনের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে।

আস্তিকের চিত্র।

কল্পনা করা যাউক যে এক ব্যক্তি ঈশ্বর অর্থাৎ অনন্ত জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্ত মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরের উপর একান্ত নির্ভরশীল। তাঁহার মনে সর্ব্বদাই কি গভীর শান্তি বিরাজমান। স্বামী স্ত্রী, পিতাপুত্র প্রভৃতি যখন পরস্পরের প্রতি নির্ভর করিয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করে, তখন তাঁহাদের হৃদয় কেমন নির্ভয় থাকে! যে ব্যক্তি সেই পূর্ণ মঙ্গলস্বরূপে বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাঁহার নির্ভরস্থান কত গভীর! তাঁহার চতুর্দ্দিকে এই মঙ্গলপ্রসূ জগৎ বিরাজমান; ইহার প্রতি অংশে তিনি ঈশ্বরের মঙ্গলমূর্ত্তি দেখিতে পান।

বহির্জগৎ ও আস্তিক

ভূমা দ্যুলোকের মহিমার মধ্যে, প্রকৃতির চিরনবীন সৌন্দর্য্যের মধ্যে, পৃথিবীর অসংখ্য জীবজন্তুর মধ্যে, তিনি সেই জগতের স্রষ্টা, পাতা ও নির্ব্বহিতা পরমেশ্বরের জ্ঞান, মঙ্গলভাব ও অপার ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাইয়া আনন্দে পুলকিত হয়েন। গগনের প্রতি নক্ষত্র, পৃথিবীর প্রতি ফুল তাঁহার নিকটে ঈশ্বরের বার্ত্তা বহন করে। ঋতু পরিবর্ত্তনের মধ্যে, ঝড়বৃষ্টির মধ্যে, তুষার পতনের মধ্যে তিনি তাঁহারই মঙ্গলনিয়ম প্রতিষ্ঠিত দেখেন। অত্যুচ্চ পর্ব্বতরাজির মধ্যে, তৃণশোভিত শস্যশ্যামল উপত্যকাসমূহে, মহান্ জলধির মাঝে তিনি সেই বিশ্বকর্ম্মারই হস্ত দেখিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন। তিনি আরও দেখেন যে, ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে তিনি একাকী বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার অপার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন না। তাঁহার ন্যায় কত অসংখ্য আত্মা বর্ত্তমানে এবং কত অসংখ্য আত্মা অতীতকালে ঈশ্বরের করুণা ভোগ করিয়া তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করিয়াছে ও করিতেছে। তিনি ইতিহাসে

ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের মধ্যে মগ্ন হইয়া আপনাদিগকে পবিত্র করিতে চাহেন না, তাঁহারা যে আমাদের পবিত্র ভক্তিভাবকে কল্পনার উপর দাঁড় করাইবেন, স্বার্থপরতাকে তাহার ভিত্তি করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মভাবের—শ্রদ্ধাভাবের অভিজ্ঞ ; যাঁহাদের ঈশ্বরস্পৃহা একবারও উদ্রিক্ত হইয়াছে ; যাঁহাদের আত্মা একবারও ঈশ্বরের স্পর্শে উপস্থিত হইয়া তাঁহার বাণী শ্রবণ করিয়াছে, তাঁহাদের কাছে এই শ্রদ্ধাভাব নিতান্ত সত্য পদার্থ। ঈশ্বরভক্ত প্রেমিকেরা পৃথিবীর সমুদয় রোগশোকে আক্রান্ত হইলেও যাঁহার উপর নির্ভর করিয়া সেই রোগশোক সহ্য করিবার এক অপূর্ব্ব বল প্রাপ্ত হয়েন ; যাঁহাকে সমুদয় বিত্ত হইতে প্রিয়তর, পুত্র কলত্র হইতে প্রিয়তর এবং অন্য সকল প্রিয়বস্তু অপেক্ষাও প্রিয়তম বলিয়া জানেন ; যাঁহাকে হারাইলে তাঁহারা জগৎ সংসারকে অন্ধকার দেখেন, সেই প্রেমিকদিগের নিকটে এমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই বলিলে তাঁহারা স্পষ্টই জানিতে পারেন যে, নাস্তিকেরা নিজেই ঈশ্বর হইতে দূরে আছেন, তাই তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন না অথবা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেও তাঁহারা দেখিবেন না। আত্মার নীতিজ্ঞানের অস্তিত্বপক্ষে যাহা যাহা বলিয়াছি এই শ্রদ্ধাভাবের অস্তিত্বপক্ষে সেই সকল সম্পূর্ণই খাটে। সরলভাবে দেখিলেই হয় যে শ্রদ্ধাভাবের বীজ না থাকিলে তাহার পরিস্ফুরণ কখনই দেখিতে পাইতাম না। সমগ্র ধর্ম্মজগতের ইতিহাস জ্বলন্ত ভাষায় ইহারই সাক্ষ্য দিতেছে। যে ভক্তিভাবের প্রাবল্যে এক কালে বৈদিক ধর্ম্ম সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিয়াছিল, যাহার বলে ঋষিরা সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া ভগবৎপদসেবায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়া উপনিষদ্ প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থনিহিত অমূল্য

সত্য লাভ করিয়াছেন, এই সে দিন পর্য্যন্ত যে ভক্তিভাবের স্রোতে চৈতন্যদেব সমগ্র বঙ্গভূমিকে উন্মত্ত করিতে পারিয়াছিলেন, আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, সেই ভক্তিভাব—সেই শ্রদ্ধাভাব মিথ্যা নহে—ইহা আমাদের আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধি অতি গুরুতর সাক্ষ্য এবং এই ভক্তিভাব যে ঈশ্বরের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছে, তিনিও পরম সত্য, পরম মঙ্গলস্বরূপ মহান্ আত্মা।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ প্রবন্ধে ব্রহ্মতত্ত্বে শ্রদ্ধাবাদ নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায়—ব্রহ্ম অনন্তস্বরূপ।

আমরা যাহা কিছু বলিয়া আসিলাম, তাহার মধ্যে ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছি যে পরমেশ্বর অনন্তস্বরূপ; ইহা আমাদের আত্মপ্রত্যয়ই বলিয়া দিতেছে। আমরা অনন্তস্বরূপের অনন্ত ভাব সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে পারি না বটে, কিন্তু অনন্তের চিন্তা, অনন্তের ভাব যে আমাদের জ্ঞানের, চিন্তার অপরিহার্য্য ধর্ম্ম একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আত্মপ্রত্যয় যে সকল সত্য আমাদের নিকটে প্রকাশ করিয়াছে সে সকলই যখন সত্য বলিয়াই প্রতীতি হইল, তখন এই সত্যকে কখনই মিথ্যা ভ্রান্তি বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। স্পেন্সর বলেন যে, যিনি অনন্ত, সমস্তই তাঁহা হইতে অবিচ্যুত; সৃষ্টি করিলে যখন নূতন একটী ব্যাপার জন্মগ্রহণ করিল, তখন সেই সৃষ্ট পদার্থ তো তাঁহা হইতে অবিচ্যুত হইল না। স্পেন্সর এখানে নিতান্ত জড়বাদ আনিয়াছেন বা মানবীকরণ করিয়াছেন বলিতে পারি। দুইটী জড়পরমাণু হইতে একটী পরমাণু পৃথক্ করিয়া লইলে,

যেমন অপর একটী পরমাণু অবশিষ্ট থাকে অথবা সন্তান প্রসূত হইলে যেমন মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, স্পেন্সরও এখানে এইরূপ কোন ভাব গ্রহণ করিয়া নিতান্ত ভ্রমে পড়িয়াছেন। আজ যাহা সৃষ্ট হইল, তাহা মনুষ্যের পক্ষে যেন নূতন, সৃষ্টি-ব্যাপারসম্বন্ধে মনুষ্যের যে কল্পনা আছে, তাহার পক্ষে যেন নূতন যুক্ত হইল; কিন্তু ঈশ্বরসম্বন্ধে তাহা নূতন নহে। তাঁহার অনন্তত্বসাগরে—অনন্তশক্তিসাগরে উক্ত নবসৃষ্ট পদার্থ চিরকালই বিরাজ করিতেছিল, শুধু আমাদিগের নিকট অপ্রকাশিত ছিল। যদি ঈশ্বরের শক্তিসাগরে উহা নিমজ্জিত না রহিত, তবে কি তাহা কখনও সৃষ্ট হইতে পারিত? যাহা ঈশ্বরের শক্তিতে নাই, তাহার সৃষ্টি অসম্ভব। সৃষ্টি করা, আর না করা সম্পূর্ণ তাঁহার ইচ্ছাধীন। সৃষ্টি করিলেও কোনো কিছু নূতন তাঁহাতে যুক্ত হইল না, সৃষ্টি না করিলেও তাঁহাতে কোনো কিছু বিযুক্ত রহিল না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে অনন্তের চিন্তা আমাদের আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ একটী সত্য। এই অনন্তের ভাব এত স্বাভাবিক যে, অধ্যাত্ম-বাদী দূরে থাক্, অজ্ঞেয়বাদীও ইহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না। *

এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব এবং সমস্ত জগত মুক্তকণ্ঠে বলিবে, যে আমাদের জ্ঞান, শক্তি প্রভৃতি সকলই সেই ভূমা অজ আত্মার সাক্ষিস্বরূপে দণ্ডায়মান।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ প্রবন্ধে ব্রহ্ম অনন্ত-স্বরূপ নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* Essays up on Some Uncontroverted questions by Prof. Huxley, P. 220.

৫

উপসংহার।

আমরা চারিটী প্রস্তাবে দেখিয়া আসিলাম যে, ঈশ্বর পূর্ণভাবে বিরাজ করিতেছেন; তিনি মঙ্গলময়, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ মহান্ পুরুষ। আমরা তাঁহার সম্বন্ধে এতগুলি বিষয় জানিলাম এবং জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতির সঙ্গে লোক হইতে লোকান্তরে গিয়া তাঁহার বিষয় আরও অনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারি। সুতরাং স্পেনস্সর-প্রমুখ অজ্ঞেয়বাদিগণ যখন বিজ্ঞতাচ্ছলে বলিবেন "The power, which the universe manifests to us is utterly unscrutable" (First Prin. P. 46) তখন আমরা বলিব যে "আমরা তোমাদিগের ভ্রান্তযুক্তি সকল অবলম্বন করিব না"; আমরা বরঞ্চ তাঁহাদিগকে বলিব যে 'তোমরা ঋষিদিগের পথানুসরণ করিয়া আত্মপ্রত্যয়কে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর, আত্মাতে তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা কর, তবেই সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবে।" আমরা তাঁহাদিগকে দেখাইব যে ঋষিরা যে সত্য অন্তরে প্রাপ্ত হইয়া জলন্তভাষায় প্রচার করিয়াছেন—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি, শান্তং শিবমদ্বৈতং"—সেই সত্য আজিও জগতের অনেক জাতি হতাশ-হৃদয়ে অন্বেষণ করিতেছে। ঋষিরাই প্রথম বলিয়া গিয়াছেন "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং" আত্মাই পরমাত্মাকে দর্শন করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। ঋষিরাই বলিয়া গিয়াছেন

"তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ

আত্মজ্ঞেরাই সেই জ্যোতির জ্যোতি পরমাত্মাকে জানিতে পারেন।

এবং এই কথায় আমাদের আত্মাও সম্পূর্ণ সায় দেয়। আমরা দেখিলাম যে কারণবাদ ও প্রজ্ঞাবাদের ন্যায় নীতিবাদও ঈশ্বরের অস্তিত্ব উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করে।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত অধ্যাত্ম-ধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ প্রবন্ধে ব্রহ্মতত্ত্বে নীতিবাদ নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

একাদশ অধ্যায়—ব্রহ্মতত্ত্বে শ্রদ্ধাবাদ।

এইবারে দেখিব যে শ্রদ্ধাবাদও ঈশ্বরের অস্তিত্বপক্ষে চিরসাক্ষ্য দিতেছে। আমাদের আত্মাতে আধ্যাত্মিকতা বা শ্রদ্ধাভাব আছে। ইহা আমরা আত্মপ্রত্যয়কে অবলম্বন করিয়া জানিতেছি। এই শ্রদ্ধাভাব কোন সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ *থাকিতে চাহে না; ইহা অনন্তস্বরূপের চরণতলে গিয়া* বিশ্রাম করিতে চাহে। এই শ্রদ্ধাভাব থাকাতেই আমরা সেই মহান্ পরমেশ্বরকে আমাদের দয়াময় পিতা বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি। এই আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ শ্রদ্ধাভাবকে আশ্রয় করিয়াই আমরা আপনাদিগকে তাঁহার সন্তান বলিয়া উপলব্ধি করি। এই শ্রদ্ধাভাবের দ্বারাই আমরা তাঁহাকে মঙ্গলময় বলিয়া জানিতে পারি এবং জগতে তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার পরিচয় পাইয়া ভক্তিভরে নমস্কার করি। জগতে যে এক শক্তি মঙ্গলের পক্ষে কার্য্য করিতেছে, মনুষ্যকে উন্নতির পথে লইয়া গিয়া দেবতুল্য করিতেছে, এ বিষয়ে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সকলেই স্বীকার করেন যে পরিণামে সত্যেরই জয় এবং অসত্যেরই পরাজয় স্থির; এই কথা আমাদের আত্মার নিকট হইতেও সম্পূর্ণ সায় পায়—আমরাও সাধু ব্যক্তির প্রতি অহেতুকী প্রীতি করিয়া

এবং অসাধুকে তাহার অসাধু কর্ম্মের জন্য ঘৃণা করি। মঙ্গলের জন্য, সাধুতার জন্য আমাদের এত স্পৃহা, এত আগ্রহ কেবল সেই মঙ্গলময় পরমেশ্বর কর্ত্তৃক্ই আমাদের অন্তরে নিহিত হইয়াছে।

শ্রদ্ধাভাব স্বার্থপরতার রূপান্তর নহে।

অনেক দার্শনিক যেমন নীতিজ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাকে উড়াইয়া দিতে চাহেন, সেইরূপ এই শ্রদ্ধাভাবকেও বিশ্লেষণ করিয়া ইহাকে উড়াইয়া দিতে চাহেন। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে নীতিজ্ঞান দার্শনিকদিগের সহস্র বিষবাণসত্ত্বেও আমাদের অন্তরে অক্ষতভাবেই জীবিত আছে এবং এখানেও দেখিতেছি যে, সহস্র বিষবাণের মধ্যেও আমাদের শ্রদ্ধাভাব জীবিত আছে। এই মতের দার্শনিকগণ বলেন যে; যখন সমাজের মধ্যে প্রচুর অন্নসংস্থান হইল, সাংসারিক উন্নতি দেখা দিল, তখন লোকেরা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর, উপাসনা, পূজা প্রভৃতির এক কাব্যমাত্র প্রস্তুত করিল। প্রকৃতপক্ষে ধরিলে এই সকল বিষয় পার্থিব প্রীতি প্রভৃতির অতিরিক্ত কিছুই নহে। তাঁহাদের মতে ঈশ্বরভক্তি, বলিতে গেলে, স্বার্থপরতা ও কল্পনার মিশ্রণে উদ্ভূত। যাঁহাদের ঈশ্বরভক্তি নাই, তাঁহারা এপ্রকার কথা বলিতে পারেন। যাঁহাদের চক্ষু নাই, তাঁহারা যদি বলেন যে সূর্য্য নাই, তবে কি প্রকারে বুঝাইব যে সূর্য্য আছে; যাঁহারা বধির, তাঁহারা যদি বলেন যে সঙ্গীতপদার্থ জগতে নাই, তবে তাঁহাদিগকে তাহার অস্তিত্ব বুঝাইতে আমরা অক্ষম। যাঁহারা স্বার্থপরতায় আপনাদিগের হৃদয়কে জড়াইয়া রাখিয়াছেন, তাঁহারা নিঃস্বার্থভাবের পবিত্র আনন্দ কিপ্রকারে উপলব্ধি করিবেন? যাঁহারা জগতে ঈশ্বরের সুন্দর পরিচয় দেখিতে চাহেন না, যাঁহারা জগতে ঈশ্বরের নীরব উপদেশ শুনিতে চাহেন না; যাঁহারা

ঈশ্বরেরই পালনী শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হয়েন। তিনি ইহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি করেন যে, মানবজাতি ঈশ্বর কর্তৃক পরিত্যক্ত না হইয়া তাঁহারি অনন্ত জ্ঞান ও মঙ্গলভাবের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। এইরূপে তিনি যাহা দেখেন, তাহাতেই ঈশ্বরের হস্ত দেখিয়া, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা জানিতে পারিয়া সকল সংশয় হইতে মুক্ত হয়েন।

অন্তর্জগত ও আস্তিক। অধ্যাত্মবাদী কেবল যে বহির্জগতে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেন, তাহা নহে। তিনি আত্মাতেও তাহার সুখ-দুঃখের মধ্যে, আশা নিরাশার মধ্যে, আত্মার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অধিষ্ঠান আরও উজ্জ্বলরূপে, আরও জীবন্তরূপে উপলব্ধি করেন। এই পৃথিবীতে জীবাত্মা রোগশোকে, পাপতাপে কত না যন্ত্রণা পায়—সেই দারুণ যন্ত্রণার সময়েও আস্তিক ব্যক্তি ঈশ্বরের পিতৃভাব দেখিয়া যন্ত্রণাকে যন্ত্রণা বলিয়াই অনুভব করেন না। তিনি দেখিতে পান যে, সুখদুঃখ, বিপদ সম্পদ,—কিছুই অন্ধশক্তি কর্তৃক আমাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য প্রেরিত হয় নাই; যখন তিনি সম্পদে পরিবৃত হয়েন, তখন তিনি কেবল তাহা উপভোগ করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন না, তিনি তখন তাঁহার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতাভারে অবনত হইয়া [illegible]ন। বিপদের গাঢ় অন্ধকার যখন তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলে, তখন তিনি ইহা জানিয়া নির্ভয় হয়েন যে, ভগবান তাঁহাকে তাঁহার সহিত সহবাসের অধিকতর উপযুক্ত করিয়া লইতেছেন।

আস্তিকের চিহ্ন। এইরূপে ঈশ্বরের সহিত নিত্য সহবাসে তাঁহার হৃদয় প্রস্তুত হইতে থাকিলে সেখানে অহঙ্কারের লেশমাত্র অধিকার থাকে না—প্রশান্ত বিনয় তাঁহার হৃদয়কে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া বসে। তাঁহার সহিত এক মুহূর্ত্ত বাক্যালাপ করিয়া দেখ, তিনি তাঁহার নিজের কথা কিছুমাত্র উত্থাপন করিবেন না—তাঁহার

মুখে কেবল তাঁহারই কথা শুনিতে পাইবে, যাঁহার প্রসাদে তিনি সাধুকর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন; তিনি সর্ব্বদাই আপনার হৃদয়কে সেই মহান্ সত্তার সত্তায় পূর্ণ করিয়া রাখেন। এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃতির সঙ্গীত শুনিতে পাইয়া অপূর্ব্ব আনন্দে মগ্ন হইয়া থাকেন। এইরূপ ব্যক্তিরই আত্মা হইতে সঙ্গীত উঠিয়াছে—

"আনন্দ ধারা প্রবাহে কিবা আজি
হৃদাকাশ মাঝে
শত চন্দ্রমা বিরাজে।
দেখরে হৃদে অনুপম ভাব সুন্দর মধুময় —
একদৃষ্টে আত্মার পানে
মাতা হয়ে অবনত
আছেন প্রেমভাবে তাকায়ে; শূন্য পূর্ণ আজি।

সাধক পুরুষদিগের সঙ্গীত শুনিলেই বুঝা যায় যে, তাঁহারা সকল অপেক্ষা প্রিয়তম, আত্মা হইতেও প্রিয়তর পুরুষের সান্নিধ্য কেমন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করেন। তাঁহাদের নিকটে দুদণ্ড বসিয়া থাক, দেখিবে যে তাঁহাদের আত্মা হইতে কি এক অপূর্ব্ব জ্যোতি বাহির হইয়া তোমাতে প্রবেশ করিতেছে! সাধু ব্যক্তির সন্নিধানে নিঃশব্দ পদক্ষেপ করিতেও সাহস হয় না, পাছে সেটুকু শব্দেও তাঁহার ধ্যানের ব্যাঘাত ঘটে।

অনেক উন্নতির মূলে ধর্ম্ম।

আরও দেখি যে, জগতের বিস্তর উন্নতির মূল সূত্রপাত হইয়াছে ধর্ম্মের দ্বারা। যখন য়ুরোপ অসভ্যতা ও অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে মগ্ন ছিল, তখন যিশুখৃষ্টের শিষ্যগণ তাহাদের মধ্যে যে উন্নত ধর্ম্মপ্রচার করিলেন, তাহারই প্রভাবে আজ য়ুরোপীয় জাতি কত উন্নত হইয়াছে। আরবীয়গণ যখন জড়

পূজায় মগ্ন ছিল, তখন উন্নততর মহম্মদ-প্রচারিত ধর্ম্মের দ্বারা কত না উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। নানা কারণে মুসলমানদের যে অবনতি ঘটিয়াছে, তাহা এখানে আলোচ্য নহে; তথাপি ইহাও বলি যে, অবনতির এক প্রধান কারণ—বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হওয়া। অসভ্য জাতিগণ যখন সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্র-পরিবেষ্টিত আকাশের দিকে তাকাইয়া ইহাদের স্রষ্টা ও মঙ্গলবিধাতা ও পাতার অন্বেষণ করিতে গেল, সেই অন্বেষণের মধ্যে কি গভীর উন্নতির বীজ লুক্কায়িত ছিল। শরীর নির্ব্বাহের জন্য চেষ্টা করিতে গিয়া মানবের যত জ্ঞানের চর্চ্চা হয়, যত উন্নতি হয়, আত্মানুসন্ধান, ঈশ্বরতত্ত্বান্বেষণ করিতে গিয়া তদপেক্ষা যে শতগুণ অধিক জ্ঞানের চর্চ্চা হয়, উন্নতি ও আনন্দ হয়, তাহা বলা বাহুল্য। ভারতের ঋষিশ্রেষ্ঠ শাণ্ডিল্য প্রথম প্রকাশ করিলেন যে, আত্মার আত্মাই পরমাত্মা। * আর সেই বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া ভারতের কত উন্নতি হইল। ঋষিদিগের আত্মাতে পরমাত্মদর্শন ঘটিয়াছিল বলিয়াই ভারতের অমূল্য রত্নসমূহের প্রভারাজি আজিও দেখিয়া জগত চক্ষু সার্থক করিতে পারিতেছে। ইহারই বলে বেদ উপনিষদ্ এবং ইহারই বলে রামায়ণ ও মহাভারত। এতক্ষণ আস্তিক জীবনের সবিস্তার আলোচনা করিয়া দেখিলাম। এইবারে নাস্তিক জীবনের একটী চিত্র কল্পনা করিয়া তাহার ফলাফল বিচার করিয়া দেখিব।

নাস্তিকের চিত্র

একটী নাস্তিকের চিত্র কল্পনা করা যাউক। সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, আত্মাতে বিশ্বাস করে না সুতরাং পরকালেও বিশ্বাস করে না। হায়! তাহার নির্ভর করিবার

* ছান্দোগ্য উং।

একটী প্রাণও নাই ইহা অপেক্ষা মনুষ্যের দুর্ভাগ্য আর কি আছে? এক দিকে প্রকৃতির দয়ামায়া-বিরহিত অন্ধশক্তি সমূহ, অপরদিকে সেই ক্ষুদ্র মনুষ্য। সে জানে না যে, কোথা হইতে সে এই কঠোর সংসারের সংগ্রামক্ষেত্রে আসিয়াছে; সে জানে না যে, কেমন করিয়া সে এখানে বর্দ্ধিত হইতেছে; সে জানে না যে, দুই দিন পরেই আবার কোথায় তাহাকে যাইতে হইবে। সে কেবল এই মনে করে যে, সে সমুদ্রে জলবুদ্বুদবৎ কতকগুলি অন্ধশক্তি কর্ত্তৃক আনীত হইয়া সংসারে সজ্ঞানভাবে বিচরণ করিতেছে, আবার কিছুদিন পরে সেই সকল অন্ধশক্তি কর্ত্তৃক জলবুদ্বুদের ন্যায় বিনষ্ট হইবে। কি ঘোর অন্ধকার! সর্ব্বাপেক্ষা তাহার নিজের অস্তিত্বই অধিক সমস্যার বিষয়। তাহার অন্তরে যে জ্ঞান, যে প্রীতিভক্তি বর্ত্তমান থাকিয়া তাহাকে পরিচালিত করিতেছে, সে সকল আসেই বা কোথা হইতে এবং কি উদ্দেশ্যেই বা তাহারা আসিয়াছে, তাহার কোন সদুত্তর সে দিতে পারে না; সে ইহাতে কেবল মৃত্যুরই প্রতিকৃতি দেখিতে পায়। তাহার ধর্ম্মজ্ঞান ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইতে থাকে; কারণ, যখন ন্যায় অন্যায় কিছুদিনের স্বপ্নমাত্র, তখন সেই ন্যায়ের স্বত্ব বজায় রাখিবার জন্য কেন সে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিবে?

সংশয়বাদীর সুখ-শান্তি নাই। নাস্তিকের বা সংশয়বাদীর সুখশান্তি থাকে না। তোমার পিতা মৃত্যুশয্যায় শয়ান অথবা তোমার প্রিয়তমা ভগিনী রোগের যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছেন; সেই ভীষণ সময়ে তোমার কি কষ্ট! তুমি যদি আস্তিক হও, তবে তুমি ভগবানের হাতে সকলই সমর্পণ করিয়া কেমন শান্তিলাভ কর। তাঁহারা পরলোক প্রাপ্ত হউন অথবা আরোগ্য লাভ করিয়া ইহলোকেই জীবিত থাকুন, তুমি জান যে, তাঁহারা

কোন অবস্থাতেই ঈশ্বরের প্রেমরাজ্যের বাহিরে যাইতে পারিবেন না—ইহাতে তোমার কতটা উদ্বেগ, শ্রান্তি ও ক্লান্তি দূর হইল। কিন্তু তুমি যদি সংশয়বাদী হও, তাহা হইলে তোমার পক্ষে এসকল সান্ত্বনা কোথায়? তোমার হৃদয় পাষাণ হইয়া গিয়াছে; তোমার নিকট এই সকল সান্ত্বনার কথা আর পাষাণের নিকট ক্রন্দন করা, এই উভয়ই সমান। সংশয়বাদী কাহার উপর নির্ভর করিয়া শান্তি পাইবে? তাহার ঈশ্বরের উপর নির্ভর করা দূরে থাক্, সে পৃথিবীতেও কোনো ব্যক্তির উপর নির্ভর করিতে পারে না। নির্ভর করিবে কিরূপে? তাহার নিকট সকল মনুষ্যই শূন্য বা জড়ে পরিণত। জড় বা শূন্যের উপর কেহই নির্ভর করিতে পারে না এবং যদি নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, তবে তাহার সুখস্বপ্ন শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। সংশয়বাদী বা অজ্ঞেয়বাদীর মতে কোনও মনুষ্যেরই আত্মা নাই বা জানা যায় না, তাহারা কেবল ঐন্দ্রিয়ক অনুভবের সমষ্টি মাত্র। সুতরাং তীক্ষ্ণ বিচারশীল নাস্তিক কখনই এরূপ জড় ঐন্দ্রিয়ক অনুভবের সমষ্টির উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারে না। শোকের সময় সে কাহারও নিকট সহানুভূতি প্রত্যাশা করিতে পারে না; হৃদয়ের প্রেম অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারে না; কারণ, জড়বস্তু প্রেমের আস্বাদ গ্রহণ বা প্রতিদান করিতে পারে না স্ত্রীপুত্রের নিকট সে ভালবাসা প্রার্থনা করিতে পারে না পিতামাতার নিকট স্নেহ লাভ করিতে পারে না—কারণ, সকলেই জড় ঐন্দ্রিয়ক অনুভবের সমষ্টি মাত্র, জড় বস্তুর নিকট এক-জন সচেতন মনুষ্য কিসের প্রত্যাসা করিতে পারে? কিছুরই নহে।

নাস্তিকের অশান্তি বিষয়ে ডেবিড হিউমের সাক্ষ্য।

য়ুরোপীয় নাস্তিক্যবাদের প্রধান প্রচারক ডেবিড হিউম এইরূপ বিচার করিয়া নিরাশার গভীরতম অন্ধকারে পড়িয়া বলিয়া গিয়াছেন—"মনুষ্যের বুদ্ধির বিরোধ ও অসম্পূর্ণতা বিষয়ে চিন্তা করিয়া আমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে এবং আমি যুক্তি ও বিশ্বাস, সকলই পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমি কোথায় আছি—কে-ইবা আমি? আমার উৎপত্তিই বা হইল কিরূপে এবং পরিশেষে কি অবস্থায়ই বা পরিণত হইব? কাহারই বা অনুগ্রহ প্রার্থনা করিব, কাহারই বা নিগ্রহ ভয় করিব? কাহারাই বা আমাকে ঘেরিয়া আছে? কাহার উপরেই বা আমার অথবা আমারই উপরে বা কাহার প্রভাব বিস্তৃত হইতেছে? এই সকল প্রশ্ন দ্বারা বিমোহিত হইয়াছি এবং আমার বোধ হইতেছে যে, অন্ধকার আমাকে গ্রাস করিতেছে; আমার অঙ্গ সকল যেন শিথিল হইতেছে।" * নাস্তিকহৃদয়ের এইরূপ মর্ম্মভেদী কাতরোক্তি শুনিলে পাষাণও বিগলিত হইয়া যায়।

ঐ বিষয়ে গীতার সাক্ষ্য।

শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে, নাস্তিকের ইহলোক নাই, পরলোক নাই, নাস্তিকের কোথাও সুখ নাই—

"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ গী, ৪অ, ৩৪

নাস্তিক্যবাদে সাধুভাবের মূলচ্ছেদ।

নাস্তিকহৃদয়ের কথা বলিলাম কিন্তু নাস্তিকহৃদয়ই বা আসে কিরূপে? বিচার করিলে দেখিব যে, নাস্তিক যে যুক্তি অনুসারে অপরের আত্মার

* Treatise on human nature book 1. Part IV sect 7

লোপাপত্তি করিয়া তাহাকে ঐন্দ্রিয়ক অনুভবের সমষ্টি মাত্র বলেন, সেই যুক্তি অনুসারে তিনি নিজেও লুপ্ত হইয়া ঐন্দ্রিয়ক অনুভবের সমষ্টিমাত্র হইয়া পড়েন। ঐন্দ্রিয়ক অনুভবের সমষ্টি আছে কিন্তু অনুভব করিবার লোক কেহ নাই—ইহা নিতান্তই বাতুলতা। অনুভব করিবার কর্ত্তা না থাকিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, অনুভূতিও নাই। যাই হোক, এবিষয় পরে বিচার করিয়া দেখা যাইবে। আপাতত এইটুকু বুঝিলাম যে নাস্তিকের যুক্তি অবলম্বন করিলে এমন এক ঘোর সংশয়বাদ আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহাতে পৃথিবীতে অন্ততঃ যাহা কিছু সাধু আছে, সকলেরই মূলচ্ছেদ হইয়া যায়—কর্ত্তব্যের অধিকার থাকে না, ভক্তিপ্রীতি আকাশ কুসুম হইয়া পড়ে, সৎকর্ম্মের প্রতি আস্থা চলিয়া যায়।

আস্তিক্যবাদে সাধুতার বৃদ্ধি।

আস্তিক্যবাদে কর্ত্তব্যের অধিকার দৃঢ়বদ্ধ হয়, ভক্তিপ্রীতি সংসার মরুভূমিকে কুসুমকোমল করিয়া তুলে, সৎকর্ম্মের প্রতি মন স্বতই ধাবিত হয়। আস্তিক্য ও নাস্তিক্যের প্রভেদ—আলো ও অন্ধকারের প্রভেদ, স্বর্গ ও নরকের প্রভেদ। এই স্থানে স্বর্গ ও নরকের তুলনা দেওয়াতে অনেক নাস্তিকতা-পক্ষপাতী ব্যক্তি ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন এবং অনেক সৎকর্ম্মশীল নাস্তিক ব্যক্তিদিগের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলিতে পারেন—"অমুক অমুক নাস্তিক বটে কিন্তু তাঁহারা শত শত আস্তিক অপেক্ষা ভাল।" ইহা সত্য হইলেও হইতে পারে; কিন্তু এখানে মূল কথা এই যে অমুক অমুক নাস্তিক ব্যক্তি প্রকৃত আস্তিকের পথানুসরণ করিতেছেন, প্রকৃত নাস্তিকের পথানুসরণ করেন নাই। প্রথমত, প্রকৃত নাস্তিকের কোন কর্ম্মই হইতে পারে না; কারণ, সে কতকগুলি অন্ধ জড় ঐন্দ্রিয়ক অনুভবের সমষ্টি মাত্র, সুতরাং সে

নিজে কর্ত্তা নহে। দ্বিতীয়ত, তাহার কর্তৃত্ব স্বীকার করিলেও তাহার পক্ষে কোন উচ্চ অঙ্গের নিঃস্বার্থপর কর্ম্ম সম্ভবে না—ইহার আভাস ইতিপূর্ব্বেই দিয়া আসিয়াছি; কারণ, কেহই যখন জড় বস্তু ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, তখন সে কেন সেই জড় বস্তু সকলের জন্য আপনার স্বার্থ ত্যাগ করিবে; সে কেন অপর জড় বস্তু সকলের ক্ষতি করিয়াও আপনার ভোগাভিলাষ পরিতৃপ্ত না করিবে? এই সকল কারণে অজ্ঞেয়বাদীদিগের কোনও নেতা এই ভাবে বলিয়াছেন যে, আস্তিক্যমত ভ্রান্ত হইলেও তদনুসারে কার্য্য করিলে জগতের ভালই হয়।*

অধ্যাত্মতত্ত্বের সত্যতা বিষয়ক বিচার কর্ত্তব্য।

যাই হৌক, এখন দেখিলাম যে, আস্তিক্যবাদে সুফল হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, নাস্তিক্যবাদে কুফল হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা; আর পৃথিবীর অধিকাংশ বক্তি আস্তিক্যবাদই অবলম্বন করিয়াছে, অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, আত্মায় বিশ্বাস করে ও পরকালে বিশ্বাস করে—এখানে ঈশ্বরে কি ভাবে বিশ্বাস করে সে প্রশ্ন উঠিতেছে না। এতৎসত্ত্বেও আমাদিগের দেখিতে হইবে যে, যে ঈশ্বরের উপর আমরা নির্ভর করিতেছি, তিনি কল্পনা-প্রসূত, কি, তাঁহার বাস্তবিক সত্তা আছে; তিনি কেবল অন্ধভক্তির রচিত কাল্পনিক পাত্র, কি আমরা সত্য জ্ঞানের দ্বারা আলোচনা করিয়া তাঁহার অস্তিত্ব প্রকৃতই উপলব্ধি করিতে পারি। যদি জ্ঞানেতে তাঁহাকে না পাই, তবে তাঁহার প্রতি, নাস্তিকের কথা দূরে থাক্, আমরাই বা কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন

---

* At least this is a good working hypothesis.—J. S. Mill.

করিব? কোনও সজ্ঞান ব্যক্তি কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া বালির উপর গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারে না। কল্পনার উপর যত দীর্ঘকাল নির্ভর করিয়া থাকিব, ততই আমাদের সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। বিপদের মধ্যে মগ্ন হইয়া থাকা অপেক্ষা তন্মধ্য হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। সুতরাং অধ্যাত্মতত্ত্বের বিচারে পশ্চাৎপদ হওয়া আমাদের কখনই উচিত নহে। এইরূপ বিচারে অধ্যাত্মতত্ত্বের সত্যতা উপলব্ধি করিলে আমাদের হৃদয়ে অপার শান্তি আসিবে, এই আশায় আমরা সেই ঈশ্বরেরই করুণার উপর নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি।

ঈশ্বরের নিকট আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা।

যাঁহাকে জানিয়া ভারতের ঋষিগণ বলিতে পারিয়াছেন—

> "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
> ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

তিনিই আমাদিগের সহায় হইয়া স্বীয় মঙ্গলময় ক্রোড়ের পথ-প্রদর্শক হউন।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত অধ্যাত্মধর্ম্ম
ও অজ্ঞেয়বাদ প্রবন্ধে ফলাফল বিচার
নামক প্রথম অধ্যায়
সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অধ্যাত্ম সন্ধান-প্রণালী।

সংশয়বাদের স্থূল কথা। প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছি যে, অধ্যাত্ম-বাদীগণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, আত্মায় বিশ্বাস করেন ও পরকালে বিশ্বাস করেন। সংশয়বাদী বা অজ্ঞেয়-বাদীগণ অধ্যাত্মতত্ত্বে বিশ্বাস বা নির্ভর করিতে পারেন না। অজ্ঞেয়-বাদীগণ অধ্যাত্মবাদীদিগকে এই বলিয়া উপহাস করেন যে, ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি তাঁহাদিগের স্বকপোলকল্পিত বাক্য মাত্র—উহাঁ-দিগের কোন বাস্তব সত্তা নাই বা থাকিলেও জানিতে পারা যায় না। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহারা কোন প্রকার যন্ত্রের দ্বারা অধ্যাত্মতত্ত্ব ইন্দ্রিয়-গোচর করিতে পারেন নাই এবং কঠোর প্রামা-ণিক তর্কের দ্বারাও অধ্যাত্মতত্ত্বে উপনীত হইতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহারা ঈশ্বর বা আত্মার অস্তিত্বে অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না। তাঁহাদের কথার ভাবে বোধ হয় যে, তাঁহাদিগের মতে উক্ত দুই উপায় ভিন্ন অধ্যাত্মতত্ত্বে পৌঁছিবার অন্য উপায় নাই। অন্য উপায় যদি থাকে, তবে তাহার এবং তৎসঙ্গে ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণেরও ভার তাঁহারা অধ্যাত্ম-বাদীদিগের স্কন্ধে চাপাইয়া নিশ্চিন্ত আছেন। অজ্ঞেয়বাদীদিগের কেহ কেহ আপনাদিগের চিরপুষ্ট মত সকলের ভ্রম বুঝিয়াও তাহা স্বয়ং-বর্দ্ধিত বিষবৃক্ষের ন্যায় পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া নানা পরস্পরবিরোধী বাক্য সকলের অবতারণা করিয়া থাকেন।

অধ্যাত্মতত্ত্বের প্রমাণ-ভার কাহার উপর? অধ্যাত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিবার পক্ষে উক্ত দুই উপায় ভিন্ন অন্য উপায় আছে কি না বিবেচনা করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের দেখা কর্ত্তব্য যে, ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণের ভারটা কাহার স্কন্ধে রক্ষা করা উচিত।

অধ্যাত্মতত্ত্ব যদি কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু হইত, অথবা কোন তর্কগ্রাহ্য নিগমন (conclusion) মাত্র হইত, তাহা হইলে এইরূপ প্রমাণের ভার গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনাই আবশ্যক হইত না। ইন্দ্রিয়গোচর কোন বস্তুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহ প্রতিবাদ করিলেও আমরা তাহাকে সেই বস্তুর প্রত্যক্ষ অনুভব করাইতে পারি। তর্কগ্রাহ্য নিগমনের প্রতিবাদ করিলে আমরা তর্কশাস্ত্রের নিয়ম অনুসরণ করিয়া প্রতিবাদীকে তাহাতে উপনীত করাইতে পারি। ঈশ্বর ও আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুও নহেন এবং তর্কগ্রাহ্য নিগমনও নহেন; ঈশ্বর ও আত্মা অধ্যাত্মবাদীদিগের নিকটে স্বপ্রকাশ। কঠোর তর্কের দ্বারা বা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির দ্বারা প্রমাণ করিতে না পারিলেই যদি অজ্ঞেয়বাদীদিগের নিকটে অধ্যাত্মতত্ত্বের অস্তিত্ব সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে তাহার প্রমাণের ভার গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা আমরা অনাবশ্যক মনে করি না; কারণ যদি দেখি যে, অধ্যাত্মবাদীদিগের উপর প্রমাণের ভার থাকা উচিত নহে, তবে যতক্ষণ অজ্ঞেয়বাদীগণ ঈশ্বরের ও আত্মার অস্তিত্ব অপ্রমাণ করিতে না পারিবেন, ততক্ষণ ঈশ্বরের ও আত্মার অস্তিত্ব অপ্রমাণিত গণ্য হইবে না।

অজ্ঞেয়বাদীর উপরেই প্রমাণভার থাকা কর্ত্তব্য। অধ্যাত্মবাদ জগতের সাধারণ ধর্ম্ম।

অধ্যাত্মবাদীগণ বলেন যে, তাঁহাদের অধ্যাত্মতত্ত্বের সুদৃঢ় ভিত্তি আছে এবং যতদিন অজ্ঞেয়বাদীগণ ঈশ্বর ও আত্মার অনস্তিত্ব স্পষ্ট প্রমাণ করিতে না পারিবেন, ততদিন তাঁহাদের অধ্যাত্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করিবার কোনই কারণ নাই। অজ্ঞেয়বাদীদিগকে অধ্যাত্মবাদীদিগের এই কথা বলিবার যথেষ্ট অধিকার আছে। অধ্যাত্মবাদ কোনও নূতন মত নহে। ইহা মানবজাতির অতি পুরাতন ধর্ম্মবিশ্বাস। মানবের যে অবস্থার

বিবরণ উদ্ঘাটন করিতে ইতিহাস অক্ষম, সে অবস্থাতেও এই অধ্যাত্মবাদই মানবের ধর্ম্মবিশ্বাস ছিল। এই অধ্যাত্মবাদ ব্যক্তি-বিশেষে বা সাম্প্রদায়বিশেষে বদ্ধ নহে এবং কালবিশেষেও বদ্ধ নহে। এই সুবিশাল ভূখণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ঘুরিয়া আইস, দেখিবে যে, কি সভ্য, কি অসভ্য সকল জাতিরই (উন্নত বা অনুন্নত) আধ্যাত্মবাদে দৃঢ় বিশ্বাস। একটী দৃষ্টান্ত দিলেই আপাতত চলিবে। বৌদ্ধেরা নাস্তিক বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু তাহারাও প্রকৃত নাস্তিকতা রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহারা বুদ্ধকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বররূপে এবং তাঁহার অধীনস্থ অনেক দেবদেবীর কল্পনা করিয়া মানবের স্বভাবসিদ্ধ আস্তিকভাবেরই স্বপক্ষে জয়-জয়কার করিতেছে। বর্ত্তমান বৌদ্ধনেতারা অধিকতর স্পষ্ট-প্রায় অধ্যাত্মতত্ত্ব স্বীকার করিতেছেন। অধ্যাত্মবাদের স্বপক্ষে যখন সমগ্র মানবজাতি একবাক্যে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, তখন অজ্ঞেয়বাদীগণ সহসা অধ্যাত্মবাদকেও ভ্রান্ত বলিতে পারেন না এবং বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ না দর্শাইয়া অধ্যাত্মবাদীদিগকে স্বমত সমর্থন করিবার জন্য সগর্ব্বে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতে পারেন না। অধ্যাত্মবাদীগণ বলিবেন "সমগ্র মানবজাতিই আমাদিগের মত ও বিশ্বাসের সত্যতা বিষয়ে সাক্ষী; যদি কেহ ইহা অসত্য মনে করেন, তবে তিনিই ইহার ভ্রান্তি প্রদর্শন করুন।"

দৃষ্টান্ত। সম্মুখের উপবনে একটী আম্রবৃক্ষ আছে। আমার পিতৃপুরুষগণ সেই আম্র বৃক্ষ আমাদিগকে দেখাইয়াছেন ও তাহার ফল-ভোগ করিয়াছেন; আবার আমরা সেই আমগাছ দেখিতেছি, দেখাইতেছি, তাহার ফলভোগ করিতেছি ও করাইতেছি। এখন যদি কোন অন্ধব্যক্তি সেই আমগাছ হইতে দূরে থাকিয়া আমা-দিগকে বলে, 'তোমরা যে আমগাছের কথা বলিতেছ, তাহা

তোমাদের স্বকপোল-কল্পিত, তোমাদের আমগাছের বাস্তব সত্তা নাই; কারণ, তাহার বাস্তব সত্তা থাকিলে আমি দেখিতে পাইতাম বা অনুভব করিতে পারিতাম,' তাহা হইলে কি তাহার বাস্তব সত্তা অস্বীকৃত হইবে? তাহার সত্তার প্রমাণ দিতে আমরা বাধ্য নাই; কারণ, আমরা প্রত্যক্ষ জানিতেছি যে, আমগাছটী আছে; পরন্তু সেই অন্ধব্যক্তিই আমগাছের অসত্তা সম্বন্ধে তাহার নিজের অনুভব করিবার অক্ষমতা ব্যতীত অন্য প্রমাণ দিতে বাধ্য। সেই রূপ, যখন সমগ্র মানবজাতি অধ্যাত্মবাদের স্বপক্ষে সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে, তখন অজ্ঞেয়বাদীদিগের ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে না যে, মানুষ ঈশ্বর ও আত্মাকে জানে না বা জানিতে পারে না এবং ইহা বলিলেও চলিবে না যে, ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্বের স্বপক্ষেও অনেক কথা বলিবার আছে, বিপক্ষেও অনেক কথা বলিবার আছে; তাঁহাদের মত সুদৃঢ় রাখিতে গেলে প্রমাণ করা আবশ্যক যে, ঈশ্বর ও আত্মা নাই বা থাকিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহারা এই পথে না চলিয়া ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণের ভার অধ্যাত্মবাদীদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন।

অজ্ঞেয়বাদীর দলপুষ্টি কেন? ইতিপূর্ব্বে যে সকল কথা বলিলাম তাহাতেই কতকটা বুঝা গিয়াছে যে, অজ্ঞেয়বাদীদিগের মত তেমন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত নহে। তবে যে আজকাল তাঁহাদের দলপুষ্টি হইতেছে, তাহার কারণ এই যে, হক্স্‌লি, টিণ্ডাল প্রভৃতি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই মত সমর্থন করিতেছেন। জনসাধারণের স্বভাবই এই যে, বিদ্বান্ লোকে এক বিষয়ে পণ্ডিত হইয়া অপর বিষয়ে অপণ্ডিতের ন্যায় কথা বলিলেও তাহারা সেই কথা নির্ব্বিচারে শিরোধার্য্য করে; তাহা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাহাদের ভাবিয়া দেখা

কর্ত্তব্য যে, বক্তা কোন্ বিষয়ে পণ্ডিত। হয়তো কোন জ্যোতির্ব্বেত্তা এক সময়ে অল্পস্বল্প চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু রোগী ব্যক্তি রোগের সময়ে সেই জ্যোতির্বেত্তাকে আহ্বান করিবে অথবা কোন সুচিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিবে? সেইরূপ সাধারণের ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, হক্স্লি, টিণ্ডাল্, ডার্বিন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদিগের নিকটে বিজ্ঞানের বিষয়ই জ্ঞানলাভ করা যাইতে পারে এবং ব্রহ্মবিষয়ে প্রত্যক্ষানুভূতিশীল ব্রহ্মবাদীদিগের নিকটেই আত্মতত্ত্ব জানিতে গেলে সন্দেহের নিরাকরণ হইতে পারে।

অতীন্দ্রিয় বলিয়া অধ্যাত্মতত্ত্ব পরিত্যজ্য, এই আপত্তি খণ্ডন।

যাহাই হউক, এখন দেখিতেছি যে, অজ্ঞেয়বাদীগণ অধ্যাত্মতত্ত্ব অবগতি হইবার প্রণালী প্রদর্শনের ভার অধ্যাত্মবাদীদিগের উপরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। অধ্যাত্মবাদীগণের অবলম্বিত প্রণালী প্রদর্শনের পূর্ব্বে অজ্ঞেয়বাদীগণ যে সকল প্রণালী অবলম্বন করিয়া অধ্যাত্মতত্ত্ব জানিতে অক্ষম হইয়াছেন, সেইগুলি কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। তাঁহাদিগের প্রথম কথা এই যে, ঈশ্বর ও আত্মাকে কোন প্রকার ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অনুভব করা যায় না এবং কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক প্রণালী দ্বারাও ইন্দ্রিয়গোচর করা যায় না; সুতরাং তাঁহারা বলিতে পারেন না, ঈশ্বর ও আত্মার অস্তিত্ব আছে কি না। ইহা বৃথা জল্পনা। আমাদিগের ইন্দ্রিয় সকলের সহিত ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের কোনই সম্পর্ক নাই। ইন্দ্রিয়গণ স্বয়ং জড়পদার্থ এবং তাহারা বহির্বিষয় জড়পদার্থেরই অস্তিত্ব বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতে পারে; জড় ইন্দ্রিয়গণ আপনাদিগের কারণকে প্রকাশ করিতে পারে না। কঠোপনিষদেও আছে—"পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্ত-

স্বাত্মন্।" অর্থাৎ স্বয়ম্ভূ ঈশ্বর ইন্দ্রিয় সকলকে বহির্বিষয়ব্যাপৃত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এই কারণে তাহারা বহির্বিষয়ই অনুভব করিতে পারে, অন্তরাত্মাকে পারে না। অধ্যাত্মবাদীদিগের স্বীকৃত ঈশ্বর ও আত্মার যদি প্রকৃতই অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলেও তাঁহারা কখনই ইন্দ্রিয়গোচর হইতে পারেন না; কারণ তাঁহাদিগেরই মতে ঈশ্বর ও আত্মা উভয়ই ইন্দ্রিয়াতীত। যদি অনন্ত আকাশে "ঈশ্বর আছেন, আত্মা আছে," এই কথাগুলি খোদিত দেখিতে পাই বা ধ্বনিত শুনি, তাহা হইলেও আমাদিগের অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ উপলব্ধ হইল না—আমরা একটী লেখা দেখিতে পাইলাম বা একটী কথা শুনিতে পাইলাম মাত্র।

অধ্যাত্মতত্ত্বে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর অগ্রাহ্য।

যে কারণে ঈশ্বর ও আত্মাকে ইন্দ্রিয়গোচর করা যায় না, সেই কারণেই তাঁহাদিগকে বৈজ্ঞানিক প্রণালী দ্বারা আবিষ্কার করিবার কথা কহাও বাতুলতা মাত্র। বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া জড় ইন্দ্রিয়গণ জড়তত্ত্বই আবিষ্কার করিতে পারে। বৈজ্ঞানিক প্রণালী যতই সূক্ষ্ম ও দূরদর্শী হউক না কেন, তাহা জড় পদার্থেরই কার্য্যবিবরণ লইয়া ইন্দ্রিয়গণের সম্মুখে উপস্থিত করে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা নানা জড়তত্ত্ব আবিষ্কারে কৃতকার্য্যতাবশত আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া এই স্থূল কথাটী ভুলিয়া যান। তাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহাদের যন্ত্রাদির নিকটে কি জড়তত্ত্ব, কি অধ্যাত্মতত্ত্ব কিছুই প্রচ্ছন্ন থাকিবে না। তাঁহারা এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আত্মা সম্বন্ধে বা ঈশ্বর সম্বন্ধে কথা বলিতে গেলেই স্বীয় পাণ্ডিত্য স্মরণ করিয়া কিছু গর্ব্বিতস্বরে উপহাস করিতেও ত্রুটি করেন না। কেহ কল্পনাবলে স্থির করিয়া ঘোষণা করিলেন, "ঈশ্বরের প্রাণসৃষ্টি অপেক্ষা না করিয়া জড়পদার্থ স্বয়ং প্রাণী উৎপাদন

করিয়া থাকে।" (১) কেহ বা বলিলেন যে, তিনি সমস্ত আকাশ দূরবীক্ষণ দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াও কুত্রাপি ঈশ্বরকে দেখিতে পান নাই; (২) কেহ বা বলিলেন যে, তিনি সমস্ত মস্তিষ্ক অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখিয়াও আত্মাকে দেখিতে পান নাই; নেপোলিয়ন বোনা-পার্ট যখন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি জ্যোতির্ব্বিদ লাপ্লাসকে জিজ্ঞাসা করি-লেন যে, তিনি তাঁহার স্বপ্রণীত পুস্তকে (Mechanique celeste) ঈশ্বরের নামোল্লেখ করেন নাই কেন, তখন লাপ্লাস তদুত্তরে বলি-লেন যে, তাঁহার সেরূপ কোন কল্পনা করা আবশ্যক হয় নাই। এই সকল বিদ্রূপ উপহাসে অধ্যাত্মবাদীগণ কিছুমাত্র বিচলিত হন না, কারণ তাঁহারা ইহা বিশেষরূপে জানেন যে, সহস্র দূরবীন, সহস্র অনুবীক্ষণ ঈশ্বর বা আত্মার কিছুমাত্র অনুভব করাইতে সক্ষম হয় না। আর ইহাও বলা দ্বিরুক্তি মাত্র যে, যখন ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়াতীত কোন পদার্থ অবগত করাইতে পারে না, তখন যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রণালী বা যন্ত্রাদি অবলম্বন করিয়া সেই ইন্দ্রিয়গণই কার্য্য করিতেছে, সেই সকল প্রণালী বা যন্ত্রাদিও কিছুতেই ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুকে প্রকাশ করিতে পারিবে না।

অধ্যাত্মতত্ত্ব কঠোর তর্কেরও অগ্রাহ্য।

অজ্ঞেয়বাদীদিগের দ্বিতীয় কথা এই যে, তাঁহারা কঠোর তর্করাশির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াও অধ্যাত্মতত্ত্বে উপনীত হইতে পারেন নাই। কেবল তর্কের দ্বারা অধ্যাত্মতত্ত্ব লাভ করা যায় না। আমাদের ঋষিরা এই কথা অতি সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। একদিকে মহা-

---

(১) অধ্যাপক হেকেল ও ব্যাষ্টিয়ান্।

(২) ফরাসি জ্যোতির্ব্বিদ লালান্।

মতি ব্যাসদেব বলিতেছেন "তর্কা প্রতিষ্ঠানাৎ" তর্কের দ্বারা ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠা হয় না (বে, সূ,) অপরদিকে উপনিষদ্কারগণও বলিতেছেন "অতর্ক্যং", "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" অর্থাৎ আস্তিক্যবুদ্ধি তর্কের দ্বারা পাওয়া যায় না (কঠোপনিষদ্)। কঠোর তর্কের দ্বারা কেন যে অধ্যাত্মতত্ত্ব উপলব্ধ হয় না, তাহা তর্কপদার্থের প্রতি একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে। তর্কের নিয়মই এই যে, তাহার একটা উদাহরণ (major premise) বা উপনয় (minor premise) * অবলম্বন চাই—অবলম্বন না পাইলে তর্ক দাঁড়াইতেই পারে না। শূন্যে শূন্যে তর্ক চলিতে পারে না। তর্কের আর একটী নিয়ম এই যে, তর্কের নিগমন (conclusion) অবলম্বনের সহিত সমধর্ম্মী হইবে। আমি যদি জ্যামিতি সম্বন্ধীয় কোন কথাকে ব্যাপ্তি বা হেতু ধরি, তবে তদবলম্বিত তর্ক পরম্পরার নিগমনও জ্যামিতি সম্বন্ধীয়ই হইবে, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় হইতে পারিবে না; ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যাপ্তি বা হেতু অবলম্বন ধরিলে নিগমন বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় হইতে পারিবে না; মন সম্বন্ধীয় ব্যাপ্তি বা হেতু অবলম্বন ধরিলে নিগমন জড়সম্বন্ধীয় হইতে পারে না।

আদিজ্ঞান। নানা বিষয়ক তর্কের ব্যাপ্তি ও হেতু নানা বিষয়ক হইবে। কাপড়ের কলে তূলা না দিলে যেমন কাপড় প্রস্তুত হইতে পারে না, সেইরূপ অবলম্বন না পাইলে তর্করাশি কোন প্রকার জ্ঞানই প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু কলটী না থাকিলে যেমন তূলাও দেওয়া যাইত না, সুতরাং কাপড়ও প্রস্তুত হইত না, সেইরূপ তর্ক আরম্ভ হইবারই পূর্ব্বে আমাদের এমন কতকগুলি জ্ঞান থাকা আবশ্যক, যেগুলি না থাকিলে বিশেষ বিশেষ তর্কের

* major premiseএর বঙ্গানুবাদ করিলাম উদাহরণ বা ব্যাপ্তি; minor premiseএর বঙ্গানুবাদ করিলাম উপনয় বা হেতু।

বিশেষ বিশেষ অবলম্বনই প্রাপ্ত হইতাম না। সেই জ্ঞান সকল আমাদের অন্তরে নিহিত আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপে দু একটী উল্লেখ করিতে পারি। কার্য্য থাকিলেই তাহার কারণ থাকে, এই জ্ঞান আমাদের অন্তরে জন্মাবধি নিহিত আছে। অতি শিশুরও নিকটে হাত নাড়িতে থাক বা কিছুর ছায়া ফেল, সেও তাহার কারণ অন্বেষণে ইতস্তত চক্ষু ফিরাইয়া থাকে। অতি শিশুও তাহার জ্ঞানের প্রথম উন্মেষ হইতেই বুঝিতে পারে যে, সেই দেখে, শুনে, কার্য্য করে। এইরূপ কতকগুলি জ্ঞান হইতে আমরা ব্যাপ্তি অবলম্বন গ্রহণ করিয়া থাকি এবং এই গুলি সকল তর্কের আদি-জ্ঞান ও মূলাধার এবং সকল তর্কের অতীত হইয়া মানব মাত্রেরই অন্তরে নিহিত আছে। বিশেষ বিশেষ বিষয়ক তর্কের বিশেষ বিশেষ উপনয় এই সকল সাধারণ উদাহরণ সমূহের বিশেষ ভাবে প্রয়োগ মাত্র। একটী দৃষ্টান্ত দিই। কার্য্য থাকিলেই তাহার কারণ থাকে, এইটী সাধারণ ও তর্কের অতীত জ্ঞান হইল। এখন একটী কার্য্য দেখিলাম যে বৃক্ষ হইতে ফল পড়িতেছে। সুতরাং স্থির করিতে বাধ্য হইলাম যে ফলের পতনরূপ কার্য্যের নিশ্চয়ই কারণ আছে। যদি কোন বিশেষ তর্কের, ফলপতনের কারণ আছে, এইরূপ কোন একটা হেতু গ্রহণ করি, তাহা কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে, এই সাধারণ ও তর্কের অতীত ব্যাপ্তি জ্ঞানেরই ফলপতনরূপ ঘটনায় বিশেষভাবে প্রয়োগ মাত্র।

তর্কের অতীত আদিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত।

কার্য্যকারণ জ্ঞানের ন্যায় তর্কের অতীত আরও অনেকগুলি জ্ঞান মানব মাত্রেরই অন্তরে নিহিত আছে। 'আমি আছি, করিতেছি' প্রভৃতি জ্ঞান কেহই তর্ক করিয়া প্রাপ্ত হয় না; অথচ সকল তর্কের মূলে এই জ্ঞানগুলি না থাকিলে তর্কই চলিতে পারে না। বাহ্যবস্তুর (তাহা অনুভূতি-

রূপে বা অন্য যে কোন রূপে আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হউক না কেন) বহিঃসত্তায় (objective existence) জ্ঞান এই প্রকার তর্কের অতীত জ্ঞান। ফল পড়িতেছে দেখিয়া, তাহাতে বিশ্বাস করিয়া তবে তর্কের সূত্র গ্রহণ করিতে পারি যে ফলপতনরূপ কার্য্যের কারণ আছে। আমরা এই প্রকার তর্কের অতীত জ্ঞানবলেই যেমন বহিশ্চক্ষের সমক্ষে প্রকাশিত বাহ্যবস্তুর বহির্ভাব জানিতে পারি, তেমনি অন্তশ্চক্ষের সমক্ষে প্রকাশিত মানসিক ভাব ও চিন্তা এবং অধ্যাত্মতত্বেরও অন্তর্ভাব (subjective existence) জানিতে পারি। অধ্যাত্মতত্ত্ব ও বাহ্যবস্তু এই উভয়ই আমাদের বুদ্ধির গ্রাহ্য এবং আমরা উভয় হইতেই প্রামাণিক তর্কের ব্যাপ্তি ও হেতু (premise) গ্রহণ করিতে পারি। ইতি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তর্কের নিয়মই এই যে, তর্কের ব্যাপ্তি ও হেতু যে বিষয়ের হইবে, নিগমনও তদ্বিষয়ক হইবে। ইহাও আমরা দেখিয়া আসিলাম যে, মানসিক ভাব বা অধ্যাত্মবিষয়ক তর্কের ব্যাপ্তি ও হেতু ধরিলে নিগমন কালে মানসিক বা অধ্যাত্মবিষয়েই আসিয়া পড়িতে হয়। সেইরূপ আমরা যদি বাহ্যবস্তুবিষয়ক ব্যাপ্তি ও হেতু অবলম্বন করি, তাহা হইলে তর্কের পরিণামে আমাদিগকে বাহ্যবস্তু বিষয়ক নিগমনে আসিতে হইবে; কঠোর দার্ষ্টান্তিক (Inductive) তর্কের নিয়মে আবদ্ধ হইয়া আমরা কখনই বহিঃপ্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া মানসিক বা অধ্যাত্ম রাজ্যে পৌছিতে পারিব না।

অধ্যাত্মতত্ত্ব তর্কের উপসংহার নহে।

এখন, আমরা অধ্যাত্মতত্ত্ব তর্কের দ্বারা স্থির করিতে চাহিয়া যদি ঈশ্বর ও আত্মাকে আমাদের মানসিক ভাবোদ্ভূত তর্কপরম্পরার উপসংহারমাত্র অথবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাকৃতিক পদার্থ বলিয়া ধরিয়া লই,

তাহা হইলে, প্রকৃত অধ্যাত্মতত্ত্ব কিছুতেই নির্ণীত হইবে না। পূর্ব্বে দেখিয়া আসিয়াছি যে, ঈশ্বর ও আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ নহেন, সুতরাং তাঁহাদিগকে শুদ্ধ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অথবা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহায্যে ইন্দ্রিয়গোচর করা যায় না। তাঁহারা যদি মানসিক ভাবপ্রতিষ্ঠিত তর্কপরম্পরার উপসংহার মাত্র হয়েন, তথাপি আমরা প্রামাণিক তর্কের অনুরোধে ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিব না যে, আমাদের মানসিক তর্কপরম্পরায় অস্তিত্ব ব্যতীত তাঁহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে কি না। যদি তাঁহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব (objective existence) থাকে, তবে তাহা প্রামাণিক তর্কের অতীত। আর যদি তর্ক পরম্পরায়মাত্র তাঁহাদের অস্তিত্ব থাকে, তবে তাঁহারা অধ্যাত্মবাদীগণের অবলম্বিত ঈশ্বর ও আত্মা হইতে পারেন না। তবে, যদি তর্কের অতীত আধ্যাত্মিক সত্য অবলম্বন করিয়া সদ্বিচার করি, তবেই আমাদের অন্তরে অধ্যাত্মবাদীগণের অবলম্বিত অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রতিভাত হইবে। অধ্যাত্মবাদীগণ বলেন যে, তাঁহারা যে আত্মাকে জানেন, সে আত্মা শূন্য আত্মা নহে, সে আত্মা জীবন্ত জাগ্রত পরমেশ্বরের জীবন্ত জাগ্রত "হিরণ্ময় কোষ"; এবং তাঁহারা যে জাগ্রত জীবন্ত ঈশ্বরকে প্রার্থনা করেন, তিনি যেমন কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রাকৃতিক পদার্থ নহেন, সেইরূপ কোন প্রকার পরিমিত জীবের মানসিক ভাবের সীমা দ্বারাও আবদ্ধ নহেন; তিনি একমাত্র আত্ম-স্পৃশ্য, নিরবয়ব, স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ।

প্রকৃতি হইতে ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ তর্কের অগম্য।

কঠোর প্রামাণিক তর্কের দ্বারা প্রকৃতি হইতেও, তাঁহার কারণরূপে, শিল্পীরূপে, নিয়ন্তারূপে, বা অন্য রূপে অধ্যাত্মবাদীদিগের অবলম্বিত প্রকৃতির অতীত ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। প্রামাণিক তর্কের নিয়মে প্রকৃতি হইতে

কারণ খুঁজিলে প্রাকৃতিক কারণই দেখিতে পাইব; প্রাকৃতিক কার্য্যের অকৃত কারণ উপলব্ধি করা প্রামাণিক তর্কের অতীত। কঠোর তর্কের দ্বারা প্রকৃতি হইতে ঈশ্বরকে তাহার শিল্পীরূপে * স্থির করিতে পারি না। প্রাকৃতিক কার্য্য সম্বন্ধে আমরা কোন প্রকার মানসিক কারণ কখন প্রত্যক্ষ অনুভব করি নাই; সুতরাং যদিও আমরা আমাদের অন্তরে চিরনিহিত সহজজ্ঞান পরিচালনা করিয়া বুঝিতে পারি যে, এই জগৎশিল্পের রচয়িতা এক পূর্ণ পুরুষ আছেন কিন্তু কঠোর তর্কের নিয়ম অনুসরণ করিয়া বলিতে পারি না যে, প্রকৃতির শিল্পী ও নিয়ন্তারূপে এক পূর্ণ পুরুষ বিদ্যমান। এতক্ষণে দেখিলাম যে, কঠোর প্রামাণিক তর্ক অবলম্বন করিয়া কোনরূপেই তর্কের অতীত, প্রকৃতির অতীত, অধ্যাত্মবাদীদিগের স্বীকৃত অধ্যাত্মতত্ত্ব উপলব্ধ হইতে পারে না।

আত্মপ্রত্যয়ই অধ্যাত্মতত্ত্ব জানিবার পথ।

অজ্ঞেয়বাদীগণ এই সীমা পর্য্যন্ত আসিয়া যখন দেখেন যে, তাঁহারা অধ্যাত্মতত্ত্ব লাভ করিতে পারিলেন না, তখন তাঁহারা বলেন যে, অধ্যাত্মতত্ত্ব কোন উপায়েই জানা যাইবে না, সুতরাং তাহার আর অধিক অন্বেষণ করিবারও আবশ্যকতা নাই। ঈশ্বর ও আত্মাকে জানিবার যে অন্য প্রকৃষ্ট পথ আছে, তাহা তাঁহারা দেখেন না। তাঁহারা স্বচিহ্নিত ক্ষুদ্র পথে গমন করিয়া যে অধ্যাত্মতত্ত্ব লাভ করিতে পারিবেন না, তাহা আর আশ্চর্য্য কি? অধ্যাত্মতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করিলে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ পথ পরিত্যাগ করিয়া অধ্যাত্মবাদী-

* ঈশ্বরকে জগতের শিল্পী বলিলে ক্ষুদ্র শিল্পী সূত্রধার প্রভৃতির ন্যায় কেহ যেন না বুঝেন; জগতে সূক্ষ্ম ও মহান নানা প্রকার শিল্পের (আমরা অন্য কথায় ঠিক ভাবটী প্রকাশ করিতে পারিতেছি না) চিহ্ন প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, এই কারণে জগতের রচয়িতাকে শিল্পী বলিতে বাধ্য হইলাম।

দিগের অবলম্বিত সুবিস্তীর্ণ রাজপথ ধরিয়া চলিতে হইবে। অধ্যাত্মবাদীগণ বলেন, ব্রহ্ম যখন সকলেরই কারণ এবং আত্মা যখন তাঁহার শ্রেষ্ঠ আসন, তখন অধ্যাত্মতত্ত্ব জানিতে গেলে সকল জ্ঞানের আদিজ্ঞান, সকল তর্কের অতীত ও মূলাধার এবং সকল বিজ্ঞানের আশ্রয়ভূমি আত্মার সহজ জ্ঞানকে অবলম্বন করিতে হয়। এই সহজজ্ঞানই অধ্যাত্মতত্ত্বে উপনীত হইবার সুবিস্তীর্ণ রাজপথ। ইহারই অপর ঋষিপ্রোক্ত শাস্ত্রীয় নাম আত্মপ্রত্যয়। এই আত্মপ্রত্যয় অজ্ঞেয়বাদীদিগের অবলম্বিত তর্ক প্রভৃতি উপায়গুলির সম্পূর্ণ বিপরীত। এই আত্মপ্রত্যয় হইতে আমরা আমাদের নিজ নিজ অস্তিত্ব ও কর্ত্তৃত্ব উপলব্ধি করি। অজ্ঞেয়বাদীগণ মুখে যতই কেন আত্মপ্রত্যয়কে পরিত্যাগ করিয়া তর্করাশি অবলম্বন করুন না, কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহারা তাহা করেন না। পূর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছি যে, তর্ক করিতে গেলেই তাহার মূলসূত্র চাই এবং আধ্যাত্মিক সত্য ও মানসিক ভাব এবং বাহ্যবস্তু হইতে সেই মূলসূত্র সকল গৃহীত হয়। কিন্তু প্রত্যেক তর্কের পশ্চাতে অনুসরণ করিলেই তর্কের পর তর্কে যাইতে যাইতে অবশেষে এমন এক তর্কে আসিতে হয়, যাহার মূলসূত্রগুলি তর্কের অতীত মানবসাধারণের অন্তর্নিহিত আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞান হইতে গৃহীত। ইহা বলা যাইতে পারে যে, আমি এখন যে তর্ক করিতেছি, তাহার মূলসূত্রগুলি পূর্ব্বতর্কপরম্পরার উপসংহার মাত্র, কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, সর্ব্বপশ্চাতের তর্কের মূলসূত্রগুলি তর্কের অতীত হইয়া আসিয়াছিল; তর্কের দ্বারা সেইগুলি পাওয়া যায় নাই, কারণ সেইগুলি প্রথমেই না পাইলে তর্কই চলিতে পারিত না। এখন প্রশ্ন এই যে, সেই মূলসূত্রগুলি কোথা হইতে আসিল? অন্য যাহাই হউক, সেইগুলি তর্কপরম্পরা হইতে উদ্ভূত নহে, স্বীকার করিতেই

হইবে। আবার সেইগুলি না পাইলে যখন আমরা তর্কশক্তি বা বিবেচনা-শক্তি পরিচালনা করিতে পারিতাম না, তখন সেই-গুলিকে আমাদের জ্ঞানের মূলভিত্তি, বিজ্ঞানের প্রথম সোপান সহজজ্ঞান বা আত্মপ্রত্যয়ের বিষয় ব্যতীত আর কি বলিব? যদি সেইগুলি আমাদের নিকটে সত্য প্রকাশ করে, তবে নিশ্চয়ই সেইগুলি তর্কের অতীত সত্যজ্ঞান; আর যদি তাহার বিপরীত হয়, তবে আমাদের যাবতীয় জ্ঞানই মিথ্যা, ভ্রান্তি। হয় আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, আমাদের অন্তরে তর্কের অতীত অনেক জ্ঞান নিহিত আছে; অথবা স্বীকার করিতে হইবে যে, আমরা একেবারে কিছুই জানি না। আমরা একবারে কিছুই জানি না ইহা স্বীকার করিতে পারি না, কারণ আমরা জানিতেছি যে, আমরা অনেক বিষয় জানি। ইহা স্বীকার না করিলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত্তিই থাকিতে পারে না এবং আমাদিগকে মৃত স্বীকার করিতে হয়। পক্ষান্তরে আমরা দেখিতেছি যে, তর্কের অতীত জ্ঞানের (কার্য্যকারণজ্ঞান, বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বজ্ঞান প্রভৃতির) উপর নির্ভর করিয়া আমাদিগকে অনেক কার্য্য করিতে হইতেছে, সুতরাং আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, তর্কের অতীত, প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রমাণের অতীত, অনেক জ্ঞানমূল আমাদের অন্তরে নিহিত আছে। ইহাই আমাদিগের আত্মপ্রত্যয় বা সহজ-জ্ঞান। এই আত্মপ্রত্যয়ই আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে যে, আমরা বাঁচিয়া আছি, আমরা দেখিতেছি, শুনিতেছি, কার্য্য করিতেছি। এই আত্মপ্রত্যয়ের উপর দাঁড়াইয়াই আমরা অধ্যাত্ম-তত্ত্ব জানিতে পারি। এই আত্মপ্রত্যয়ই ঈশ্বরকে জানিবার প্রকৃষ্ট অবলম্বন। আমরা ক্রমে দেখিতে চেষ্টা করিব যে, এই আত্ম-প্রত্যয়কে অবলম্বন করিয়া কিরূপে ব্রহ্মতত্ত্বে উপনীত হইতে

পারি। আর ইহাও দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, অজ্ঞেয়বাদীগণ এই আত্মপ্রত্যয়কে বিচার স্থলে ছাড়িয়াই কিরূপ গুরুতর ভ্রান্তি জালে পড়িয়াছেন।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত "অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ"
প্রবন্ধে অধ্যাত্মসন্ধান প্রণালী নামক
দ্বিতীয়াধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়—আত্মা সদ্‌বস্তু।

অধ্যাত্মবাদীর আশা।

ওয়াল্ট হুইটম্যান বলিয়াছেন—"আমরা নব্য বিজ্ঞানকে আহ্লাদের সহিত আলিঙ্গন করিব; কিন্তু বিজ্ঞানের অতীত আর একটী উচ্চতর ও মহত্তর সত্য পদার্থ আছে, তাহা অবিনশ্বর মানবাত্মা। * * * যখন বিজ্ঞান সেই উজ্জ্বলতর অধ্যাত্মতত্ত্ব ও দিব্যতর সঙ্গীতের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে, তখনই আমার মতে বিজ্ঞানের জয়জয়কার"। মার্কিন কবি গভীর বিশ্বাসের সহিত এই যে তাঁহার প্রাণের আশা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, এই আশা নিশ্চয়ই একদিন সফল হইবে, সত্যে পরিণত হইবে। আমরা ততদিন ইহলোকে জীবিত থাকি বা না থাকি, বলিতে পারি না; কিন্তু ইহা স্পষ্টই জানিতেছি যে, সেই একদিন আসিবে, যে দিন বিজ্ঞান অধ্যাত্মতত্ত্বের নিকট যাইয়া বলিবে "আমি তোমারই অঙ্গমাত্র" এবং অধ্যাত্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞান পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া উভয়ে মিলিয়া সেই ত্রিভুবনপালক মহান্ আত্মার বিজয়সঙ্গীত গাহিয়া চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে থাকিবে। আধুনিক সঙ্কীর্ণ-হৃদয় বৈজ্ঞানিকগণ সহস্র কুতর্কজালে প্রকৃত সত্যকে প্রচ্ছন্ন করাতে এই শুভদিবস আসিবার বিলম্ব ঘটিতেছে মাত্র, কিন্তু এই দিন যে আসিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

অজ্ঞেয়বাদীর বিচারে অসামঞ্জস্য।

বৈজ্ঞানিকগণ জড়তত্ত্বেরই আলোচনায় সমস্ত জীবন কাটাইয়া, জড়তত্ত্বে মস্তিষ্ক পূর্ণ করিয়া, কেবল বিরোধ করিবার আশায়, সময়ে সময়ে ইন্দ্রিয়াতীত গূঢ়রহস্য অধ্যাত্মতত্ত্বের নিকট উপস্থিত হইলে, অধ্যাত্মতত্ত্ববিষয়ক প্রকৃত সত্য যে জানিতে পারিবেন না, তাহাতে

আর কি কোন বক্তব্য আছে? তাঁহারা অধ্যাত্মতত্ত্বে উপনীত হইবার প্রকৃষ্ট পথ অবলম্বন না করিয়া কেবলই তর্কজাল বিস্তার করেন। অধ্যাত্মতত্ত্বে পৌছিবার প্রকৃষ্টপথ যে আত্মপ্রত্যয়, তাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এইস্থলে তাহা পুনর্বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। তবে এইটুকু বলিয়া রাখি যে আত্মপ্রত্যয়ের প্রতি সন্দিহান হইলে কেবল ঈশ্বরজ্ঞানের কেন, কোন প্রকার জ্ঞানেরই ভিত্তি থাকিতে পারে না। ঈশ্বর আপনার সত্তা দ্বারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পূর্ণ রাখিতে পারেন, কিন্তু আত্মপ্রত্যয়কে ছাড়িয়া দিলে আমরা তাহার কিছুই জানিতে পারিব না। অজ্ঞেয়বাদীগণও এই আত্মপ্রত্যয়কে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেখিয়া আসিয়াছি যে, কার্য্যকারণতত্ত্ব, মানসিক ভাব, বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব প্রভৃতিতে নিঃসংশয় হওয়া যুক্তি তর্কের অতীত; একমাত্র আত্মপ্রত্যয়ই আমাদিগের সংশয় দূর করিয়া সেই সকলের অস্তিত্ব বিষয়ে দৃঢ় প্রতীতি করাইয়া দেয়। আত্মপ্রত্যয় এইরূপে কি জড়তত্ত্ব, কি অধ্যাত্মতত্ত্ব সকল বিষয়ক জ্ঞানেরই ভিত্তি স্বরূপে অবস্থিত আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আত্মপ্রত্যয় জড়তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ক যাহা কিছু প্রকাশ করে, অজ্ঞেয়বাদীগণ তাহা বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করেন; কিন্তু আত্মপ্রত্যয় অধ্যাত্মতত্ত্বের যেটুকু প্রকাশ করিবে, তাহা গ্রহণ করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত ও ভীত হয়েন। (১) তাঁহাদিগের অবলম্বিত প্রণালী সমূহের সামঞ্জস্য বুঝিতে আমরা অক্ষম।

---

(১) কিছু পরে উদ্ধৃত হার্বার্ট স্পেন্সারের উক্তি এবং Dr. Martineau's preface to "A study of Religion vol. 1. দেখ।

আত্মা সদ্‌বস্তু আত্মপ্রত্যয় যেমন জড়তত্ত্বের মূলসত্য প্রকাশ করে, সেইরূপ অধ্যাত্মতত্ত্বেরও মূল সত্য প্রকাশ করিয়া থাকে। আমি দেখিতেছি, শুনিতেছি, কার্য্য করিতেছি, কিন্তু 'আমি' যে এই সকল কার্য্য করিতেছি, তাহা যুক্তি তর্কের দ্বারা সপ্রমাণ করা যায় না, তথাপি আত্মপ্রত্যয়ের বলেই বিশ্বাস করি যে আমার কৃত কার্য্য আমিই করিতেছি। আমি নদীর তীরে বসিয়া সুন্দর দৃশ্য-সমূহ দর্শন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছি এবং জানিতেছি যে সেই আনন্দ উপভোগ করিতেছি; সহসা তথায় দুইটী বালক কলহে প্রবৃত্ত হইয়া একটী অপরটীকে ঠেলিয়া নদীতে ফেলিয়া দিল; বালকটী নদীতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিল। আমি প্রথম বালকের দুর্বৃত্ত আচরণ দেখিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইলাম এবং দ্বিতীয় বালকের কষ্ট দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাহার উদ্ধারের জন্য নদীতে অবতরণ করিলাম। এখানে আত্ম-প্রত্যয় কেমন সুন্দর প্রকাশ করিতেছে যে, এই দেহপিঞ্জরাবদ্ধ একই ব্যক্তি (আত্মা) আনন্দ উপভোগ করিয়াছে, কলহ দেখিয়াছে, একটী বালককে তাহার আচরণের জন্য শতবার ধিক্কার দিয়াছে, এবং অপর বালককে রক্ষা করিবার জন্য নদীতে অবতরণ করিবার ইচ্ছা করিয়াছে এবং সর্ব্বোপরি সে নিজে জানিয়াছে যে সে এই কার্য্যগুলি করিয়াছে। এই আত্মা সর্ব্বপ্রকার চিন্তার, সর্ব্বপ্রকার অনুভূতির ভিত্তি স্বরূপে অবস্থিত, সুতরাং ইহা একটী সদ্‌বস্তু (noumenon) অর্থাৎ ইহা ক্ষণস্থায়ী অনুভূতি, চিন্তা প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত বা তিরোহিত হয় না। আমাদের আত্মা যে সদ্‌বস্তু, তাহা আমরা আত্মপ্রত্যয় হইতে প্রাপ্ত হইতেছি বটে, কিন্তু অজ্ঞেয়বাদীদিগের এক সম্প্রদায় ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে অধ্যাত্মবাদীদিগের কথিত

আত্মার সম্বন্ধ হওয়া দূরে থাক্, তাহার প্রকৃত অস্তিত্বই নাই, প্রকৃত পক্ষে তাহা কতকগুলি চিন্তা ও অনুভূতি প্রভৃতি অবভাসের সমষ্টিমাত্র।

আত্মা অবভাসের সমষ্টি, এই মত বিবৃতি।

যাহা কিছু আমাদের অন্তরে অবভাসিত হয়, তাহাই অবভাস শব্দের (phenomenon) বাচ্য। অবভাস সদ্‌বস্তুর বিপরীত। সদ্‌বস্তু স্থায়ী পদার্থ এবং অবভাস সকল ক্ষণস্থায়ী। এক সম্প্রদায়ের অজ্ঞেয়বাদীগণ অনুভূতি, চিন্তা প্রভৃতির সমষ্টির নামকরণ করেন আত্মা। তাঁহাদের মতে, আলোচনা করিলে জ্ঞান বা চৈতন্য কতকগুলি অবভাসে পরিণত হয়। এই মুহূর্ত্তে আমার যে চৈতন্য হইতেছে, তাহা এই মুহূর্ত্তের ঐন্দ্রিয়ক অনুভব বা চিন্তার অতিরিক্ত অপর কিছুই নহে; জীবনে আমি যে জ্ঞান লাভ করি, তাহা ঐপ্রকার ঐন্দ্রিয়ক অনুভব বা চিন্তার সমষ্টিমাত্র; সেই সকল অবভাসের ভিতরে "আমি' বলিয়া কোন পদার্থ লুক্কায়িত নাই। সুতরাং তাঁহাদের মতে আমি এক্ষণে অনুভূতিমাত্র হইতেছি, পরক্ষণে চিন্তামাত্র হইতেছি; একক্ষণে সুখানুভূতি হইতেছি, পরক্ষণে দুঃখানুভূতি হইতেছি, আর আমার সমস্ত জীবন সেই সকল অবভাসের সমষ্টি মাত্র। এক কথায়, আমাদের আত্মা নাই, অনেক অজ্ঞেয়বাদীর ইহাই মত। পূর্ব্বে অনেকস্থলে বলিয়াছি যে তাহারা স্পষ্ট কথায় বলেন না যে আত্মা নাই; তাঁহারা বলেন যে, যদি না এক বা ততোধিক আত্মা বা কোন সদ্‌বস্তু থাকে, তাহা আমরা কিছুতেই জানিতে পারিব না, আমরা কেবল অবভাস মাত্রই জানিতে পারি।

বিষয় ও বিষয়ী।

অজ্ঞেয়বাদীগণ যে আত্মপ্রত্যয়কে পরিত্যাগ করিয়াই ভ্রমে পড়িয়াছেন, এইবারে তাহা আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইব। আমাদের আত্মপ্রত্যয় বলিয়া দেয় যে বিষয় থাকিলেই

বিষয়ীকেও থাকিতে হইবে, নচেৎ বিষয় কাহার নিকট বিষয় হইবে এবং বিষয়ী কাহার সম্বন্ধে বিষয়ী হইবে? বিষয়ী ও বিষয় পরস্পরসম্বন্ধ বাক্য। অধ্যাত্মতত্ত্বের সমালোচনা কালে অধিকাংশ অজ্ঞেয়বাদী বিষয় ও বিষয়ীর এই ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যেন ভুলিয়া যান। ইহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না যে অনুভূতি আছে, চিন্তা আছে, অবভাস আছে অথচ এই সকলের বিষয়ী নাই। বিষয় বা ঘটনামাত্রেই নিত্য দ্বিত্ববাচী। অবভাস হইতে গেলে নিশ্চয়ই কোন বিষয়ীর নিকটে অবভাসিত হইতে হইবে; অনুভূতি কোন বিষয়ী কর্ত্তৃক অনুভূত না হইলে অনুভূতি হইতে পারে না; চিন্তার ভাবই এই যে, এক বিষয়ী চিন্তা করিতেছে, তবে তাহা চিন্তা নামে অভিহিত হইতেছে। এইরূপে দেখিতেছি, অবভাস মাত্রই আপনাকে প্রকাশ করে এবং তৎসঙ্গে বিষয়ীকেও (চলিত কথায় আমরা যাহাকে আত্মা বলি) সূচিত না করিয়া থাকিতে পারে না। অধিকাংশ অজ্ঞেয়বাদী এই আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্য না বুঝিয়া আত্মাকে অবভাসের সহিত এক করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু অজ্ঞেয়বাদীদিগের অন্যতম গুরুকুলতিলক হার্বার্ট স্পেন্সর এই সত্য বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছেন:—

এই বিষয়ে হার্বর্ট স্পেন্সরের সাক্ষ্য।

"আমাদের জ্ঞানকে কিরূপে কেবলমাত্র চিন্তা ও অনুভূতি রূপ অবভাস মাত্রে পর্য্যবসিত বলিতে পারি, যখন অবভাস বলিতেই কোন কিছু অবভাসিত বুঝাইতেছে? অথবা, যে সংশয়বাদী তাঁহার জ্ঞানকে চিন্তা ও অনুভূতি মাত্রে পর্য্যবসিত মনে করেন, তিনি কিরূপে এই সত্য উড়াইয়া দিতে পারেন যে, সেই অবভাসগুলিকে তিনি "তাঁহার" বলিয়া মনে করেন? পুনশ্চ, যদি তিনি ইহা স্বীকার করেন (এবং স্বীকার করিতে বাধ্য) যে, তিনি তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অনু-

ভব করেন, তবে তিনি কোন্ যুক্তিবলে এই অনুভূতিকে অসত্য বলিয়া মনে করিতে পারেন, যখন তিনি অন্য অনুভূতিগুলিকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়া থাকেন? যে পর্য্যন্ত তিনি এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না পারিবেন (এবং পারিবেনও না), সেই পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার নিগমন (conclusion) পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য।" সুতরাং যখন দেখিতেছি যে বিষয়ী আত্মা না থাকিলে অনুভূতি চিন্তা প্রভৃতি কোন কর্ম্মই চলিতে পারিত না, তখন আত্মাকে ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা অনুভব করা যায় না বলিয়া যে তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে, তাহা হইতেই পারে না। আত্মার অস্তিত্ব সংশয়বাদীদিগের নিকট সপ্রমাণ করিবার জন্য যদিও এতটা বাক্যব্যয় করিতে হইল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য যুক্তিতর্কের প্রয়োজন নাই—ইহা আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্য। এই বিষয়ী আত্মা বিষয়ের বিপরীত, অবভাসের বিপরীত সদ্বস্তু।

শরীর আত্মা নহে। অজ্ঞেয়বাদীদিগের আর এক সম্প্রদায় আত্মাকে অনুভূতি প্রভৃতি অবভাস সমূহের সমষ্টি বলিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে ইচ্ছুক নহেন। এই সকল অতি অজ্ঞেয়বাদীদিগের কেহ কেহ বলেন, শরীরের অতিরিক্ত আত্মা নাই এবং কেহ কেহ বলেন মস্তিষ্কের অতিরিক্ত আত্মা নাই ও অনুভূতি প্রভৃতি মস্তিষ্কের পরমাণু সমূহের গতি প্রভৃতি ভৌতিক প্রক্রিয়ার অতিরিক্ত কিছুই নহে। এখানেও বলা বাহুল্য যে, তাঁহারা আত্মপ্রত্যয়কে ছাড়িয়াই এত ভ্রমে পড়িয়াছেন। আমাদের আত্মপ্রত্যয় বলিয়া দিতেছে এবং ইতিপূর্ব্বেই যুক্তিযুক্ত বিচারেও দেখিয়া আসিলাম যে আত্মা ইন্দ্রিয়াদির অতীত সদ্বস্তু। আত্মাই দ্রষ্টা, স্রষ্টা, মন্তা, বোদ্ধা। আত্মাই দেহরূপ উপায়ের দ্বারা দর্শনাদি ক্রিয়া নির্ব্বাহ করে।

আত্মা যদি দেহ বা তাহার কোন অংশ হইত, তাহা হইলে তাহা ইন্দ্রিয়াতীত হইতে পারিত না। আত্মা যদি সমগ্র শরীর হইত, তাহা হইলে শরীরের এক অংশ বিনষ্ট হইলেও আমিত্ব-জ্ঞানের ক্ষতি হয় না কেন? প্রকৃতই শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ আত্মার জ্ঞানলাভের বিভিন্ন দ্বারস্বরূপমাত্র। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের ন্যায় বৈজ্ঞানিকদিগের অবলম্বিত দূরবীক্ষণ, অনুবীক্ষণ প্রভৃতিও আত্মার জ্ঞানলাভের দ্বারমাত্র, কিন্তু সেই সকল যন্ত্রকে কে কবে আত্মা বা 'আমি"র সহিত এক বলিয়াছেন? এই সকল যন্ত্র ও শরীরের অঙ্গসমূহের মধ্যে প্রভেদ এইটুকু যে, শেষোক্তগুলি আমার অজ্ঞাতকারণে আমি না চাহিয়াও প্রাপ্ত হইয়াছি এবং প্রথমোক্ত-গুলি আমাকে আবশ্যকমত প্রস্তুত করাইয়া লইতে হয় এবং আর একটু প্রভেদ এই যে, যন্ত্রাদি অপেক্ষা আমাদের দেহ অধিকতর পরিপাটী ভাবে সৃষ্ট অথবা প্রস্তুত। এই শরীর আত্মার জ্ঞানদ্বার-স্বরূপে এমনভাবে সৃষ্ট যে শরীরের এক অঙ্গ বিনষ্ট হইলে অপর অঙ্গের শক্তি বৃদ্ধি হইয়া সেই নষ্ট অঙ্গের ক্ষতিপূরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। আমার চক্ষু বিনষ্ট হইয়া জ্ঞানের একটী দ্বার রুদ্ধ হইতে পারে কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে শ্রবণশক্তি, স্পর্শশক্তি প্রভৃতি অপ-রাপর শক্তি বৃদ্ধি হইয়া জ্ঞানলাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া রাখিবে। বাহিরের কোন বস্তুকে জ্ঞানের দ্বার করিয়া লইলে তাহার সহিত 'আমি' বা আত্মার যে সম্বন্ধ, শরীরেরও সহিত আত্মার প্রায় সেই সম্বন্ধ। আর প্রকৃতই আমাদের এই দেহ প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, নূতন নূতন পরমাণু আসিয়া সংযুক্ত হইতেছে, পুরাতন পরমাণু বিদায় গ্রহণ করিতেছে। সুতরাং প্রত্যক্ষই দেখিতেছি, যে আত্মা নূতন পদার্থকে জ্ঞানের দ্বার করিয়া লইতেছে। যখন দেহের পরিবর্ত্তন হইলেও আমি-জ্ঞান একই রহিতেছে, তখন

আত্মাকে দেহের সহিত অভিন্ন বলা মূর্খতা মাত্র। যন্ত্রস্বরূপ শরীরের সহিত যন্ত্রী আত্মাকে অভিন্ন বোধ করা, আর কর্ম্মকার ও তাহার লৌহযন্ত্র সকলকে অভিন্ন বোধ করা একই কথা। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে আত্মপ্রত্যয়ই বলিয়া দেয়, আত্মা ও শরীর এক নহে, এখন সেই আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্য পরীক্ষিত হইয়া সংসিদ্ধ হইল।

অজ্ঞেয়বাদীদিগকে নাস্তিক বলি কেন?

অনেক স্থলেই আমরা অজ্ঞেয়বাদীদিগকে নাস্তিক নামে অভিহিত করিয়া আসিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা, আস্তিক বা অধ্যাত্মবাদী ব্যতীত জড়বাদী, সংশয়বাদী, ও নাস্তিক প্রভৃতি অন্য সকল সম্প্রদায়কেই অজ্ঞেয়বাদী নামে অভিহিত করিয়াছি। এরূপ করিবার কারণ এই যে, শেষোক্ত সম্প্রদায় সমূহের মত সকল পরস্পরের মধ্যে এরূপ মিশাইয়া যায় যে, তখন তাঁহারা কোন্ শ্রেণীর অজ্ঞেয়বাদী, তাহা বিচার করা কঠিন হয়। অধ্যাত্মবিষয় থাকিলেও তাহা অজ্ঞেয় বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস এবং অধ্যাত্ম বিষয়ের অস্তিত্বই নাই সুতরাং তাহা অজ্ঞেয় বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস, এই উভয় সম্প্রদায়ের লোকদিগের মত পরিণামে কার্য্যতঃ প্রায়ই একই রূপ হইয়া পড়ে; এই কারণে উভয় সম্প্রদায়কেই অজ্ঞেয়বাদীর মধ্যে আনয়ন করিয়াছি। বিশেষত, প্রকৃত নাস্তিক অতি অল্পই আছে। দার্শনিকগণও প্রকৃত নাস্তিককে দার্শনিক শ্রেণীর অন্তর্গত করিতে চাহেন না। ঈশ্বর নাই প্রভৃতি কথা বলপূর্ব্বক উচ্চারণ করিলেই দার্শনিকতার পরিচয় দেওয়া যায় না। এই কারণে চিন্তাশীল নাস্তিক মাত্রেই প্রায় অজ্ঞেয়বাদ বা সংশয়বাদ অবলম্বন করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, প্রকৃত অজ্ঞেয়বাদীগণ নাস্তিক নামেরই উপযুক্ত। তাঁহারা আপনা-

দিগকে যদিও নাস্তিক বলিতে ইচ্ছুক নহেন, কিন্তু তাঁহাদের মত সকল সম্পূর্ণরূপে নাস্তিকতার পক্ষপাতী। তাঁহারা "ঈশ্বর নাই", "আত্মা নাই" প্রভৃতি স্পষ্ট কথায় বলিয়া আপনাদের কুদার্শনিকতার পরিচয় দিতে চাহেন না মাত্র, নতুবা তাঁহাদের বিবৃত মত সকল নাস্তিকতা ভিত্তির উপরেই অনেকটা দাঁড়াইয়া আছে। অজ্ঞেয়বাদীদিগের অগ্রণী একস্থানে স্পষ্ট বলিয়াছেন বটে যে আমরা আত্মায় বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই, কিন্তু তৎসঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে এই বিশ্বাস যুক্তিবিরুদ্ধ। স্পেন্সর স্বীয় ভ্রান্ত বিচারপ্রণালীর ফলে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি অগত্যা আত্মাকে অজ্ঞেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন, কারণ একদিকে আমরা তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইতেছি, অপরদিকে তাঁহার অবলম্বিত বিচারে আমরা তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি। তিনি ঈশ্বরকেও একদিকে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞেয় বলিয়াছেন, অপরদিকে এই বিশ্বচরাচরকে সেই "অজ্ঞেয়ের প্রকাশ" বলিতেছেন। এইরূপে তাঁহার উক্তি সমূহে পরস্পরবিরোধী বাক্য বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, যদিও স্পেন্সর, সূক্ষ্মভাবে ধরিলে, নাস্তিক নহেন কিন্তু তাঁহার এই অজ্ঞেয়বাদ ভিত্তির উপরে গ্রথিত মত সকল প্রায়ই নাস্তিক আকার ধারণ করিয়াছে। তাহার উদাহরণ স্বরূপে তিনি আমাদের চিন্তা প্রভৃতিকে ভৌতিক জড়শক্তির রূপান্তরমাত্র বলিয়াছেন। * সুতরাং স্পষ্টই দেখিতেছি যে স্পেন্সর কার্য্যত আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছেন। আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে যুক্তিতে ব্রহ্মের অস্তিত্বও দাঁড়াইতে পারে না।

* First Principles p. 217.

অধ্যাপক হক্‌স্‌লি

আর একটী সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও অজ্ঞেয়বাদীর বিষয়ে আলোচনা করিয়া দেখাইব যে, অজ্ঞেয়বাদীদিগকে সাধারণভাবে নাস্তিক বলিবার কোন আপত্তি থাকিতে পারে না; বরঞ্চ তাঁহাদের কেহ কেহ স্পষ্টই জড়বাদী হইয়া পড়িয়াছেন। অধ্যাপক হক্‌স্‌লি তাঁহার এক গ্রন্থে "পূর্ণ অজ্ঞেয়ের" এক স্তোত্র সন্নিবেশিত করিলেও আমরা তাঁহাকে নাস্তিক, এবং এমন কি, জড়বাদীও বলিতে পারি। হক্‌স্‌লি জীবাদি নামক একপ্রকার জৈবনিক পদার্থের পারমাণবিক শক্তিসমষ্টির ফলকেই আমাদের জীবন এবং সেই জৈবনিক পদার্থের পারমাণবিক পরিবর্ত্তনেরই বিকাশকে চিন্তা প্রভৃতি মানসিক কার্য্য বলেন। তিনি আমাদের প্রতিভা, ভক্তি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মানসিক কার্য্য সকলকেও 'শরীরের বিশেষ অংশে সংঘটিত পারমাণবিক পরিবর্ত্তন মাত্র' বলেন। হক্‌স্‌লি যদিও নিজে অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) কথা প্রস্তুত করিয়া আপনার নামের সঙ্গে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং যদিও তিনি বলিয়াছেন যে, যেমন অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়, সেইরূপ জড়তত্ত্বও অজ্ঞেয়—আত্মা ও জড় আমাদের চেতনার অজ্ঞেয় ও কল্পিত কারণের নাম মাত্র—তথাপি তাঁহাকে নাস্তিক তো বলিবই, তাঁহাকে জড়বাদী বলিতেও প্রস্তুত আছি। তিনি কার্য্যতঃ জড়বাদকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। হক্‌স্‌লির ন্যায় জড়বাদী বৈজ্ঞানিকগণই অজ্ঞেয়বাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। হক্‌স্‌লি সগর্ব্বে বলিয়াছেন "বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে জড়তত্ত্ব ও কার্য্যকারণতত্ত্বের অধিকার বিস্তৃত হইবে এবং তৎসঙ্গে মনুষ্যের চিন্তারাজ্য হইতে অধ্যাত্মতত্ত্ব বিদায় গ্রহণ করিবে"। জড়বাদের এই গর্ব্বিত উক্তি সম্বন্ধে এইটুকু বলিতে পারি যে, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে অধ্যাত্মতত্ত্বের বিদায়গ্রহণ দূরে

থাক্‌, অধ্যাত্মতত্ত্ব বৈজ্ঞানিক প্রমাণাদির দ্বারা স্বীয় অধিকার দৃঢ়তর করিয়া লইতেছে।

মস্তিষ্ক আত্মা নহে। ইতিপূর্ব্বে দেখিয়া আসিলাম যে, হক্‌স্‌লি বলেন যে, জীবাদি নামক জৈবনিক পদার্থের ভৌতিক ক্রিয়াই আমাদের জীবনরূপে প্রতিভাত হয়। ইহাঁর মতে এই জীবাদি আমাদের শরীরের সর্ব্বত্রই এবং মস্তিষ্কেও আছে। হক্‌স্‌লি-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রকার যুক্তি অবলম্বন করায় ক্রমে দেখি যে, কেহ কেহ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন যে, আত্মা মস্তিষ্ক হইতে অভিন্ন। আত্মা যে দেহ হইতে ভিন্ন, তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি। আত্মা যখন দেহ হইতেই ভিন্ন হইল, তখন তাহা যে মস্তিষ্ক হইতে ভিন্ন হইবে, তদ্বিষয়ে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? মস্তিষ্ক তো দেহেরই এক অংশমাত্র, দেহ হইতে ভিন্ন নহে।

আত্মা ও মস্তিষ্কের অভিন্নতার বিপক্ষে আরও দুইটী গুরুতর প্রমাণ আছে। মস্তিষ্কই যদি আমি হইতাম, তাহা হইলে আমি যখন 'আমি'কে বা আত্মাকে জানিতে যাই, তখন আমার মস্তিষ্ক সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা উচিত। কিন্তু আমি বরঞ্চ আমার অস্তিত্ব জানিতে পারি, মস্তিষ্কের বিষয় শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকটে না শুনিলে কিছুই জানিতে পারি না। শারীরতত্ত্ববেত্তারা পরীক্ষা দ্বারা জানিয়াছেন যে মস্তিষ্কের মধ্যে প্রতিনিয়তই পরিবর্ত্তন চলিতেছে। আমি মস্তিষ্কমাত্র হইলে তাহার পবিবর্ত্তনের সঙ্গে আমার আমিত্বেরও প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন অনুভব করিতাম। আমার ক্রমাগত এইরূপ অনুভব হইত যে পুরাতন 'আমি' চলিয়া গিয়া নূতন 'আমি' হইয়াছি। কিন্তু মস্তিষ্কের সঙ্গে আমার কোন পরিবর্ত্তনই আমি অনুভব করিতে

মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আত্মার পরিবর্ত্তন নাই।

পারি না; এমন কি, আমার নিজের মস্তিষ্ক যে আছে, তাহাও অনুভব করিবার ক্ষমতা আমার নাই। কেহ এমনও বলিতে পারেন যে 'আমি'ই যখন নাই, তখন আমিত্বের ও অনুভব হইতে পারে না এবং এই কারণে মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আমিত্বেরও পরিবর্ত্তন অনুভব করি না। পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে 'আমি' বা আত্মা আছে এবং এখনও দেখিব যে আত্মার অস্তিত্ব আছেই। অজ্ঞেয়বাদী যদি বলেন যে, যে কারণেই হউক, আমিত্বের অনুভব হয় না, তবে তাহার ন্যায় ভ্রান্ত কথা আর কিছুই নাই। তাঁহারা এই আমিত্ব জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়াই প্রতি পদক্ষেপ করিতেছেন। ইহাকে ছাড়িয়া দিলে তাঁহাদের জ্ঞানের ভিত্তিই থাকিতে পারে না। এই কারণে কি অজ্ঞেয়বাদী, কি জড়বাদী সকলেই অন্ততঃ কতকাংশে আমিত্ব জ্ঞান স্বীকার করিয়া লয়েন। অজ্ঞেয়বাদীদিগের শিরোভূষণ হার্ব্বাট স্পেন্সর বলিতেছেন "ব্যক্তিগত অস্তিত্ব বিষয়ে প্রত্যেকেই অভিজ্ঞ এবং প্রত্যেকেরই নিকটে আপনার আপনার অস্তিত্বই সর্ব্বাপেক্ষা জাজ্বল্যমান।" পূর্ব্বে আর একস্থানে তাঁহার যে উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেও তিনি অজ্ঞেয়বাদীদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তাঁহারাও আপনাদের ব্যক্তিগত অস্তিত্বের (বা আত্মার অস্তিত্বের) অনুভব করেন। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে মস্তিষ্ক আমি হইলে মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আমারও পরিবর্ত্তন অনুভব করিতাম; কিন্তু তাহা করি না।

জড় পরমাণু চেতনা জানিতে পারে না। আরও এক গুরুতর কারণে মস্তিষ্ক 'আমি' হইতে পারে না। মস্তিষ্কের প্রত্যেক পরমাণুই জড় অচেতন পদার্থ, তাহারা আপনাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ। এই প্রকার পরমাণু সমূহের সমষ্টি হইতে আপনার

একত্বে অভিজ্ঞ পুরুষের উৎপত্তি অনুমান করা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব। কারণে যাহা নাই, কার্য্যে তাহা আনয়ন করিতে পারি না। আমরা আমাদের প্রত্যেকের একত্ব বিষয়ক অভিজ্ঞতারও প্রতি অবিশ্বাস করিতে পারি না—কারণ, কি অধ্যাত্মবাদী, কি অজ্ঞেয়বাদী সকল সম্প্রদায়ের লোকেই তাহা প্রত্যক্ষ জানিতেছেন এবং অজ্ঞেয়বাদীগণও যে তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন, তাহা হার্বট স্পেন্সরের উদ্ধৃত উক্তি হইতেই বুঝা যাইবে।

ভারতের বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক দুর্গতি। অনেক অতি অজ্ঞেয়বাদী বা জড়বাদী ভক্তি শ্রদ্ধা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক কার্য্য এবং অনুভূতি, চিন্তা, প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াকে মস্তিষ্কের পরমাণু সমূহের গতি পরিবর্ত্তনাদি ভৌতিক প্রক্রিয়ার সহিত অভিন্ন করিয়া বলেন, ইহা পূর্ব্বে বলিয়া রাখিয়াছি। সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ এই সকল কথা বলেন এবং আমাদের বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রগণ একদিকে এই সকল মনোরঞ্জক বিষয় পাঠ করেন, অপরদিকে তাঁহারা কি গৃহে পিতা মাতার নিকট, কি বিদ্যালয়ে শিক্ষকদিগের নিকট কোথায়ও ধর্ম্মবিষয়ে হৃদয়গ্রাহী সত্য উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন না; এই সকল কারণে তাঁহারা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের নাস্তিক্য-পক্ষপাতী কথা সকল নির্ব্বিচারে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখেন এবং পরিণামে তাহার বিষময় ফলভোগ করেন। এই পুণ্যস্থান ভারতবর্ষ সত্যধর্ম্মের, অধ্যাত্মধর্ম্মের আদি জননী এবং এই কারণে ইহাঁর যশোগীত সমস্ত সুসভ্য জগতে নিশিদিন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সে দিন সিকাগো নগরের মহাধর্ম্ম-মহোৎসবক্ষেত্রেও (Parliament of Religions) এই কথা একবাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়! ভাবিলে

মর্ম্মভেদী অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হয় যে, আজি সেই ভারতের সন্তানগণ কথায় কথায় ধর্ম্মকে উপহাস করেন, ঈশ্বরকে উড়াইয়া দেন এবং নাস্তিক্যবাদের গুরু, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের ধর্ম্মহীন কথাকে অভ্রান্ত বেদবাক্য ও তাঁহাদিগকে ইষ্টদেবতা জ্ঞান করিয়া পূজা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। এই কারণে আমাদিগকে তাঁহাদিগের প্রতিবাদরূপ কষ্টকর কর্ম্মে অবতরণ করিতে হইয়াছে।

মস্তিষ্ক প্রক্রিয়া ও অধ্যাত্ম প্রক্রিয়া বিভিন্ন।

আমরা যদি দেখাই যে মানসিক প্রক্রিয়া ও মস্তিষ্কের ভৌতিক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা হইলে আমাদের আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া যে মস্তিষ্কের ভৌতিক প্রক্রিয়া হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইবে, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং আমরা তাহাই দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। অনুভূতি চিন্তা প্রভৃতি যে আমাদের মানসিক কার্য্য, ইহা একটী আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্য। এই সকলকে মস্তিষ্কের ভৌতিক প্রক্রিয়ার সহিত একীভূত করা নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ। পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি যে, আত্মা মস্তিষ্কের সহিত অভিন্ন হইলে আত্মাকে জানিবার কালে মস্তিষ্ককেও জানিতে পারিতাম; সেইরূপ এখানেও বলিতেছি যে, অনুভূতি প্রকৃতি মানসিক কার্য্য সকল জানিবার কালে, যদি মানসিক কার্য্য মস্তিষ্ক-প্রক্রিয়ার সহিত অভিন্ন হইত তাহা হইলে, মস্তিষ্কপ্রক্রিয়াও জানিতে পারিতাম। সুস্থ অবস্থায় একপ্রকার অনুভূতি, অসুস্থ অবস্থায় অন্য প্রকার অনুভূতি অনুভব করি। অসুস্থ অবস্থায় অন্যপ্রকার অনুভূতি অনুভব করি বলিয়াই বুঝিতে পারি যে অসুস্থ হইয়াছি কিন্তু তৎকালেও মস্তিষ্কপ্রক্রিয়া তো কিছুই অনুভব করিতে পারি না। মানসিক কার্য্য ও পরমাণু পরিবর্ত্তনাদি মস্তিষ্কের ভৌতিক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীর পদার্থ। আমাদের মৃত্যুর পরেও মস্তিষ্কের ভৌতিক

কার্য্য চলিতে পারে, কিন্তু তাহার মধ্য দিয়া যে সকল মানসিক কার্য্যের উৎপত্তি হইত, তাহা আর হইবে না, কারণ দেহ আবরণ পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ী আত্মা চলিয়া গিয়াছে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া মস্তিষ্কের যাহা যাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই সকল তড়িৎ প্রভৃতি নানা উপায়ে পুনরায় মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইলেও ভৌতিক প্রক্রিয়া চলিতে পারে কিন্তু আত্মার অভাবে তাহার আর সাড়াশব্দ, তাহার জ্ঞান আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। স্পেন্সর বলেন যে আমাদের চিন্তা প্রভৃতি ব্যয়িত মস্তিষ্ক ও শরীরের গতি প্রভৃতি জড় শক্তির রূপান্তর মাত্র। ইহা যে আদতেই ঠিক নহে, তাহা বলা বাহুল্য। একটা মজুর প্রচুর শক্তি ব্যয় করিলেও তাহা হইতে আমরা অতি অল্পই চিন্তা প্রাপ্ত হইব; কিন্তু একজন ভাস্করাচার্য্য অতি অল্প মাত্র শারীরিক শক্তি ব্যয় করিলেও অনায়াসে জ্যামিতির দুরূহ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিতে পারেন। মস্তিষ্কপ্রক্রিয়া ও মানসিক কার্য্য এত ভিন্ন শ্রেণীর পদার্থ যে, যদিও আমরা জানি যে তাহারা পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ, কিন্তু কিরূপে, কি কার্য্যকারণসূত্রে যে তাহারা আবদ্ধ হইল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। অজ্ঞেয়বাদীদিগের অন্যতম আচার্য্য খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক টিণ্ডাল (Tyndal) তাঁহার একটী বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে "বিজ্ঞান যতই কেন উন্নত হউক না, সে কিছুতেই বলিতে পারিবে না যে মস্তিষ্কের ভৌতিক প্রক্রিয়ার সহিত মানসিক কার্য্য সকল কি সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ।"

যদি মানসিক কার্য্য ও মস্তিষ্কের ভৌতিক প্রক্রিয়া এত বিভিন্ন শ্রেণীর পদার্থ হইল, তখন, যে শ্রদ্ধাভক্তি প্রভৃতি আধ্যাত্মিক কার্য্যে মনুষ্যকে পশুভাব হইতে দেবভাবে উন্নত করিয়া দেয়,

সেই আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া যে ভৌতিক প্রক্রিয়া হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইবে, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ প্রবন্ধে আত্মা সম্বন্ধ নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়—আত্মা অবিনশ্বর।

আত্মা অবিনশ্বর এইবারে আমরা আত্মার একটী প্রধান স্বরূপের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিব—আত্মার অনশ্বরত্ব। বিষয়টী বুঝিতে গেলে আমাদিগকে মূলে যাইয়া ধরিতে হইবে। আমরা এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া এইটুকু পাইয়াছি যে, আমাদিগের আত্মপ্রত্যয়ে আত্মার স্বরূপবিষয়ক যে জ্ঞান পাইয়া থাকি, তাহা ভ্রান্ত নহে, তাহা সম্পূর্ণই ঠিক। আত্মা সমস্ত অবভাসের অন্তর্নিহিত সদ্বস্তু এবং আত্মা কি অবভাসের সহিত, কি দেহের সহিত, কি মস্তিষ্কের সহিত, কাহারও সহিত এক নহে—সকল হইতে পৃথক্ সদ্বস্তু। অনেক আলোচনার পর আমরা এই আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ ও যুক্তিপরীক্ষিত সত্যগুলি লাভ করিয়াছি। এখন আমাদিগকে আত্মার অনশ্বরত্বের দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। আত্মার অনশ্বরত্বের অর্থ এই যে, এক সময়ে যে আত্মা ইহলোকে দেহপিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতেছিল, দেহের বিনাশ হইলেও সে আত্মার বিনাশ হইবে না; আত্মার একত্ব থাকিবে। মৃত্যুর পরে আত্মার একত্ব থাকিবে কি না বিচার করিবার পূর্ব্বে আমাদের জীবিতাবস্থায় আত্মার একত্ব থাকে কি না বিচার করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে একস্থানে আমরা আত্মার একত্বজ্ঞান আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি এবং দেখাইয়াছি যে অজ্ঞেয়বাদীগণও তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু এখনও ইহা যুক্তিবিচারে পরীক্ষিত হয় নাই; এইবারে আমরা তাহাকে পরীক্ষিত করিয়া দেখিব, কারণ ইহলোকে আত্মার একত্বই আত্মার অনশ্বরত্বের এক প্রধান ভিত্তি।

স্মৃতিশক্তি আত্মার একত্বের একটী প্রমাণ।

ইহলোকে আত্মার একত্ব স্থির করিবার বিষয়ে আমাদিগের অন্তরস্থিত স্মৃতি ও প্রতীক্ষার ভাব যথেষ্ট সাহায্য করিবে। স্মৃতিশক্তির বিষয় আলোচনা করিতে করিতে আমরা যেমন আত্মার একত্ব বুঝিতে পারিব, সেইরূপ আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও একটী দৃঢ়তর প্রমাণ প্রাপ্ত হইব। যেমন অনুভূতি ও অনুভূতির বিষয়ী আত্মা এই দুইটী বস্তু ঐন্দ্রিয়ক অনুভব মাত্রেই অবলম্বিত হইয়া আছে, সেইরূপ স্মৃত বস্তু ও স্মৃতির বিষয়ী স্মর্ত্তা আত্মা এই দুই বস্তু স্মৃতিমাত্রেই অবলম্বিত রহিয়াছে। ইহার উপর প্রত্যেক স্মৃতিতে আর একটী বস্তু অবলম্বিত থাকে—তাহা আত্মার একত্ব জ্ঞান। প্রত্যেক স্মৃতিকার্য্যে আমরা ইহা বুঝিতে পারি যে, প্রতি অবভাসের অন্তর্নিহিত ভিত্তিস্বরূপ এক এক স্বতন্ত্র আত্মা নাই, কিন্তু আমাদের জীবনব্যাপী সমস্ত অবভাসের মূলে এক স্থায়ী সবস্তু আত্মা অবস্থিতি করিতেছে। আমি স্মরণ করিলাম যে বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি কাশীদর্শন করিয়াছিলাম। এই একটীমাত্র স্মৃতি হইতে আমরা তিনটী বিষয় জানিতে পারিতেছি (১) স্মৃতির বিষয় বা কাশী দর্শন; (২) স্মৃতির বিষয়ী বা আত্মা, যে স্মরণ করিতেছে এবং (৩) ব্যক্তিগত একত্বজ্ঞান অর্থাৎ আজ যে স্মরণ করিতেছে এবং পূর্ব্বে যাহার কাশীদর্শন ঘটিয়াছিল, এই উভয় আত্মার একত্বজ্ঞান; এক কথায় 'আমি' আজ স্মরণ করিতেছি এবং পূর্ব্বে 'আমারই' কাশীদর্শন ঘটিয়াছিল—উভয়েতেই একই 'আমি' বা আত্মরূপ স্থায়ী সবস্তু বর্ত্তমান। এই একত্বজ্ঞান শারীরিক একত্ব জন্য হইতে পারে না, বিশ বৎসরে আমার শরীরের দুইবার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন

দৃষ্টান্ত।

হইয়াছে। (১) এই একত্বজ্ঞান আবভাসিক একত্বজন্যও হইতে পারে না, কারণ একটী অবভাস ও তাহার স্মৃতি এই দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ; অবভাস ও তাহার স্মৃতি দুইই এক পদার্থ হইতেই পারে না। আত্মার একত্বজন্যই এই একত্বজ্ঞান। আমি ইহা নিশ্চিতরূপে জানিতেছি যে আমি এখন আমার কাশীদর্শনের বিষয় স্মরণ করিতেছি, কিন্তু এক সময়ে আমারই সেই কাশীদর্শন ঘটিয়াছিল। কাশীদর্শন ও বিশ বৎসর পরে তাহার স্মৃতি এই উভয় ঘটনার মধ্যে আমার আরও কত জ্ঞানলাভ হইয়াছে, কত অনুভূতি হইয়াছে, কত চিন্তা গিয়াছে, অতীত বিষয়ের কত স্মৃতি চলিয়া গিয়াছে এবং আমি এই সকল বিষয়কে ধীরে ধীরে আপনার জীবনের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছি, তথাপি এই সকল অতিক্রম করিয়াও 'আমি' বা আত্মা জানিতেছে যে, সে সেই কাশীদর্শনকালেও বিদ্যমান ছিল এবং বিশ বৎসর পরে তাহার স্মৃতিকালেও বিদ্যমান আছে। একই আত্মা না থাকিলে স্মৃতি থাকিতে পারিত না এবং স্মৃতি না থাকিলে আত্মার একত্বজ্ঞানও অনুভূত হইত না। আত্মার স্থায়িত্বজ্ঞান বা একত্বজ্ঞানই প্রত্যেক স্মৃতিতে অন্তর্নিহিত থাকে। জন ষ্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন—"আমার ধারণা এই যে ব্যক্তিগত একত্বজ্ঞান স্মৃতি হইতেই উৎপন্ন। যদি অদ্যকার যে 'আমি' কল্যকারও সেই 'আমি' না থাকি, তবে 'আত্মা' বা 'আমি' এই কথার কোনই অর্থ থাকিতে পারে না"। (২)

---

১ বৈজ্ঞানিকদিগের সিদ্ধান্ত এই যে প্রতি সাত বৎসরে আমাদের শরীরের প্রত্যেক পুরাতন পরমাণু চলিয়া যায় এবং তৎপরিবর্ত্তে নূতন পরমাণু আসিয়া শরীর সংগঠন করে।

২ "Analysis of the Phenomena of the Human mind by James mill 2ded. 1. 229.

স্মৃতি হইতে আত্মার অস্তিত্ব জ্ঞান।

স্মৃতি হইতে আমরা যেমন আত্মার স্থায়িত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইতেছি, সেইরূপ আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও দৃঢ়তর প্রমাণ পাইতেছি। আমাদের যাহা পূর্ব্বে জ্ঞানগোচর হয়, স্মৃতি শক্তি দ্বারা তাহাই পুনরুদ্রিক্ত করিতে পারি। কিন্তু যাহা কখনও আমাদের জ্ঞানগোচর হয় নাই, স্মৃতি শক্তি দ্বারা তাহার পুনরুদ্রেক করিতে পারি না। সুতরাং আমরা যখন স্মৃতিশক্তি দ্বারা ক্ষণস্থায়ী অবভাসের পশ্চাতে তাহার অতীত চিরস্থায়ী সদ্বস্তু আত্মার স্থায়িত্বজ্ঞান পাইতেছি, তখন ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, প্রত্যেক অবভাসের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার অস্তিত্বজ্ঞানও পাইয়া থাকি, কারণ স্থায়িত্বজ্ঞানের অর্থ চির-অস্তিত্বজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই নহে। অবভাসমাত্রেরই সঙ্গে তাহার পত্তনভূমি আত্মারও অস্তিত্বজ্ঞান লাভ না করিলে আমরা অবভাসসমষ্টিরও পত্তনভূমি আত্মার স্থায়িত্বজ্ঞান বা চির-অস্তিত্বজ্ঞান কিছুতেই পাইতে পারিতাম না।

প্রতীক্ষা।

স্মৃতি হইতে আমরা আত্মার যে স্থায়িত্বজ্ঞান পাইলাম, প্রতীক্ষার ভাব আলোচনা করিলেও সেই জ্ঞান আমাদের অন্তরে আরও দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইতে পারিবে। আমি দশ বৎসর পরে ফললাভ করিব বলিয়া পরিশ্রম করিতেছি। যখনই সেই ফললাভ করিলাম, তখনই জ্ঞান হইল যে দশবৎসর ধরিয়া ইহারই জন্য পরিশ্রম করিতেছিলাম। প্রতীক্ষাভাবের অস্তিত্বকালে আমি পূর্ব্ব হইতেই বোধ করিতে পারি যে পূর্ব্বের 'আমি'ই পরেও থাকিব। ফললাভ করিলে এই ভাবটী পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হয়। যদি ফললাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে বুঝিতে পারি যে 'আমি' সেই 'আমি'ই আছি কিন্তু আমি ঈপ্সিত ফল পাইলাম না মাত্র।

এতক্ষণে আমরা আত্মার অবিনশ্বরত্ব বিচার করিবার প্রকৃত ভিত্তি পাইয়াছি। দেখিয়া আসিলাম যে প্রত্যেকের আত্মা এক,—দুই বা ততোধিক নহে। এখন প্রশ্ন এই যে, এই আত্মা আমাদিগের মৃত্যুর পরেও বর্ত্তমান থাকিবে কি না। এই প্রশ্নটী দুই দিক দিয়া দেখা যাইতে পারে, অন্বয় ও ব্যতিরেক। ব্যতিরেক দিক্ দিয়া দেখিতে হইবে যে কি কি কারণে আমরা মৃত্যুর পরে আত্মার বিনাশ অযুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি এবং অন্বয়দিক্ দিয়া দেখিতে হইলে দেখিতে হইবে যে, কি কি কারণে আমরা মৃত্যুর পরেও আত্মার জীবন ও অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারি। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে আত্মা, দেহ বা মস্তিষ্ক অথবা চিন্তা প্রভৃতি অবভাস হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শ্রেণীর সদ্বস্তু। আত্মা যদি দেহের ন্যায় বা মস্তিষ্কের ন্যায় কতকগুলি জড় পরমাণুর সমষ্টিমাত্র হইত তাহা হইলে সেই পরমাণু সমূহের বিশ্লেষণে আত্মাও বিশ্লিষ্ট ও বিনষ্ট হইতে পারিত; আত্মা যদি অনুভূতি চিন্তা প্রভৃতির সমষ্টি মাত্র হইত, তাহা হইলেও দেহের ও মস্তিষ্কের বিশ্লেষণেই আত্মা বিনষ্ট হইতে পারিত, কারণ দেহ ও মস্তিষ্কের উপরেই অবভাস সমূহ স্বীয় অস্তিত্বের জন্য নির্ভর করে। কিন্তু যখন আত্মা, পরমাণুসমূহের সমষ্টি দেহ ও মস্তিষ্ক হইতে এবং তদবলম্বিত চিন্তা প্রভৃতি অবভাস হইতেও সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং বিভিন্ন শ্রেণীর পদার্থ, তখন আমরা ইহা নিশ্চয় করিয়া বলিতেই পারি না যে শরীরের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে বা অবভাসের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আত্মারও বিনাশ সংসাধিত হইবে। ব্যতিরেক ভাবে দেখিলাম যে আমরা অনেকগুলি কারণে মৃত্যুর পরে আত্মার বিনাশ অযুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিতে পারি।

মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব সম্ভব কি না।

মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্ব অসম্ভব নহে।

এইবারে অন্বয়দিক্ দিয়া আলোচনা করিব। প্রথমেই বলিয়া রাখিতেছি যে, আত্মার অনশ্বরত্ব আমাদের আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্য। এই কারণেই সকল জাতীয় ধর্ম্মেই পরকাল সম্বন্ধীয় কথার উন্নত বা অনুন্নত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

১ম প্রমাণ আত্ম-প্রত্যয়।

দ্বিতীয়ত, আমাদিগের ভৌতিক জীবনে যেরূপ জরা উপস্থিত হয় দেখি, আধ্যাত্মিক জীবনে সেরূপ দেখি না—আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতির নিয়মই রাজত্ব করিতেছে দেখিতে পাই। শরীর দুর্ব্বল হইলে আধ্যাত্মিক কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে বটে, কিন্তু তাহার উৎপত্তি শারীরিক দৌর্ব্বল্যে, আধ্যাত্মিক দৌর্ব্বল্যে নহে। শরীর ব্যবচ্ছিন্ন হইলেও আত্মার কার্য্য বলবৎ চলিতেছে, এমন দৃষ্টান্ত বিস্তর দেখা গিয়াছে। আমাদের জীবনে কেবলই দেখি ঘটনা সমূহের অবভাস প্রাপ্তি ও তজ্জনিত শিক্ষালাভ এই দুই নিয়ম ক্রমাগত কার্য্য করিতেছে। এই জ্ঞানলাভ একক্ষণে হইল আর পরক্ষণে চলিয়া গেল তাহা নহে, তাহা দ্বারা অধিকতর জ্ঞানলাভের জন্য আত্মাতে সেইগুলি সঞ্চিত থাকে। যখন উন্নতির দ্বার এইরূপ মুক্তভাবে উন্মুক্ত রহিয়াছে, তখন মৃত্যুর পরেও আত্মার বিনাশ অপেক্ষা আত্মার উন্নত জীবন থাকাই অধিকতর সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

২য় প্রমাণ উন্নতির ভাব।

আমাদের অন্তরে যে ইচ্ছাশক্তি আছে, তদ্বিষয়ে আলোচনা করিলে আত্মার অনশ্বরত্বে বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হইতে পারিবে। অজ্ঞেয়বাদীগণ আত্মার অস্তিত্ব লুপ্ত করিবার জন্য ইচ্ছাশক্তি স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন যে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা নাই,

৩য় প্রমাণ ইচ্ছা-শক্তি।

যেটুকু ইচ্ছা করি তাহাও পরাধীনভাবে। আমরা বলি, পরাধীন ইচ্ছা নাই। ইচ্ছা মাত্রই স্বাধীন। ইহা আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্য। সহস্র শক্তি দ্বারা প্রণোদিত হইলেও আমার ইচ্ছা স্বাধীন থাকিবে। আমি ইচ্ছা করিলে সত্য কথাও বলিতে পারি, ইচ্ছা করিলে মিথ্যা কথাও বলিতে পারি। সত্য ও মিথ্যা এই উভয়ের এক পক্ষ অবলম্বন করিবার পক্ষে শিক্ষা, সঙ্গ, ভয় প্রভৃতি নানা কারণ সহায়তা করিতে পারে বটে কিন্তু যখন কোন পক্ষ অবলম্বন করি, তখন স্ব-ইচ্ছায়ই তাহা অবলম্বন করি। সত্য বলিলে প্রাণদণ্ড হইবে এই যদি নিয়ম হয় তাহা হইলে আমি প্রাণ বাঁচাইবার জন্য মিথ্যা বলিলেও তাহা স্বাধীনভাবেই বলিলাম—প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া সত্য বলিতে পারিতাম। সুতরাং ইচ্ছামাত্রই স্বাধীন। অজ্ঞেয়বাদীগণ সহজে ইচ্ছা স্বীকার করিতে চাহেন না। ইচ্ছা স্বীকার করিলেই একপ্রকার আত্মারও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; ইচ্ছা আত্মারই ধর্ম্ম, শরীরের ধর্ম্ম নহে, তাহা তাঁহারা বেশ জানেন। ইচ্ছাকে অস্বীকার করা তাঁহাদের প্রাণগত ইচ্ছা হইলেও তাঁহারা তাহা করিতে পারেন না। এমন কি, জড়বাদী হক্সলিকেও বলিতে হইয়াছে "মনুষ্য যদিও একটি যন্ত্রমাত্র কিন্তু কতকাংশে আপনার পরিপার্শ্ব প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে;" আর একস্থানে "ঘটনাসমূহের পরিচালনায় আমাদের ইচ্ছা-শক্তিরও কতকটা ক্ষমতা আছে।" তিনি একই মনুষ্যকে অবস্থা-ধীন যন্ত্র এবং স্বীয় অবস্থার পরিচালক উভয়ই বলিতেছেন; একই মুখে তিনি ইচ্ছার স্বাধীনতা ও অস্বাধীনতা উভয়ই স্বীকার করিতেছেন। যন্ত্রের যখন পরিচালনাশক্তি নাই, তখন মনুষ্যকে স্বীয় অবস্থাপরিচালক (পরিমাণ যতটুকু হউক না) বলাতেই বলা হই-

স্বাধীন ইচ্ছা আছে।

তেছে যে মনুষ্য যন্ত্র নহে; আমাদের ইচ্ছা যতটুকু পরিমাণে ঘটনাস্রোতের গতি পরিচালনা করিতে পারিবে, অন্ততঃ সেইটুকু পরিমাণে আমাদের ইচ্ছা স্বাধীন। তবেই দেখিতেছি যে অজ্ঞেয়বাদীদিগেরও মতে আমাদের ইচ্ছা—স্বাধীন ইচ্ছা আছে।

ইচ্ছা কি?

এখন দেখা যাউক, ইচ্ছা পদার্থটী কি? ইচ্ছার বিশেষত্ব এই যে, অনুভূতি প্রভৃতির ন্যায় আমরা তাহা বাহির হইতে প্রাপ্ত হই না; ইচ্ছাকে, বলিতে গেলে, আমরা সৃষ্টি করি। আমাদিগের আত্মা হইতে ইচ্ছা প্রসূত হয়। অনুভূতি প্রভৃতি যেমন আপনাপনি আমাদিগের বিনা অনুমতিতে উপস্থিত হয়, ইচ্ছা সেরূপ নহে। কোন কারণে এক ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ বশত তাহাকে প্রহার করিবার কামনা সহসা অন্তরে উদয় হইল। কিন্তু আমি প্রথমেই প্রহার করিতে উদ্যত না হইয়া তাহার ঔচিত্যানৌচিত্য বিষয়ে বিচার করিতে মনস্থ করিলাম এবং পরিশেষে তাহারই ফলে প্রহার করিতে নিরস্ত হইলাম। কামনার বল আমাকে প্রহার করাইবার দিকে লইয়া যাইতেছিল; আমি যদি শুধু সজ্ঞান যন্ত্র হইতাম, তাহা হইলে সেই কামনাবলের প্রতিরোধ করা অসম্ভব হইত—কামনাস্রোতেই ভাসিয়া যাইতে হইত। কিন্তু আমি আপনার ইচ্ছার বলে কামনার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া কামনাকে নষ্ট করিয়া ফেলিলাম। কামনা যে আমাদের শরীরে এক প্রবল শক্তির উদ্রেক করে, তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। সেই

ইচ্ছা একটি শক্তি।

শক্তিকে যখন ইচ্ছা দ্বারা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইলাম, তখন ইচ্ছাও একপ্রকার শক্তি; কারণ শক্তিকে শক্তি ভিন্ন অন্য কিছু দ্বারা বাধা দেওয়া অসম্ভব। বৈজ্ঞানিকগণ শক্তির পুঞ্জীকরণ নিয়মটী নানা পরীক্ষা দ্বারা এক-

বারে নিঃসন্দেহরূপে সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছেন—শক্তির বিনাশ নাই। ইচ্ছাও যখন এক প্রকার শক্তি দেখিতেছি, তখন ইচ্ছাশক্তিরও বিনাশ নাই এবং সুতরাং ইচ্ছাশক্তি যাহার স্বরূপ, সেই আত্মারও বিনাশ নাই, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। শক্তির বিনাশ নাই, এই সত্যটী যদিও ভৌতিক শক্তি অবলম্বনে পরীক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি যে বিনষ্ট হইবে এরূপ অনুমান করিবার কোনই কারণ লক্ষিত হইতেছে না। বরঞ্চ আমরা ইহা অনুমান করিতে পারি যে, যেমন শরীরস্থ পরমাণু, অবভাস প্রভৃতি পরিবর্ত্তিত হউক বা না হউক, তাহাদের ভিত্তি-স্বরূপে অবস্থিত আত্মা চির-বর্ত্তমান থাকে, সেইরূপ শরীরের অন্তরে বা বাহিরে ভৌতিক শক্তি-সমূহ কার্য্য করুক বা নাই করুক, আত্মার আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহ কার্য্য করিতে কিছুমাত্র ক্ষান্ত থাকিবে না। আর যখন দেখি যে, এক এক ব্যক্তির ইচ্ছা-শক্তি মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অত্যন্ত সতেজ থাকে, তখন এই বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হইয়া উঠে। আমাদের পূর্ব্বতন ঋষিগণ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য যোগাভ্যাস দ্বারা ইচ্ছাশক্তিকে সহজে পরিচালনা করিতেন এবং অপরকেও তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতেন। বৈজ্ঞানিকগণ যে ভাবেন, জড়তত্ত্ব ব্যতীত অন্য কোন তত্ত্ব তাঁহাদের আবিষ্কার করিবার বিষয় হইতে পারে না, তাহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভুল। আমরা অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কত বিষয় জানিতে পারিলাম। টিণ্ডাল বৈজ্ঞানিক হইয়াও ইহা বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বেলফাস্ট্ নগ-রীয় আবোধনের উপসংহারে বলিয়া গিয়াছেন "জগতে কেবল নিউটন ছিলেন না, সেক্ষপীয়রও ছিলেন; কেবল বইল ছিলেন

ইচ্ছাশক্তির বিনাশ নাই।

না, রাফেলও ছিলেন ; কেবল কাণ্ট ছিলেন না, বীটোভেনও ছিলেন ; কেবল ডার্ব্বিন ছিলেন না, কার্লাইলও ছিলেন। ইহাঁদের সকলে সমবেতভাবে, একক নহে, মনুষ্যপ্রকৃতিকে আদর্শ প্রদান করিতে পারে। তাঁহারা পরস্পরের বিরোধী নহেন, কিন্তু পরিপূরক।"

মর্ম্ম আবৃত্তি।

এতক্ষণ আমরা আত্মার বিষয় আলোচনা করিয়া অনেক জানিতে পারিয়াছি,—আত্মা অবভাস নহে, দেহস্থ জড় পরমাণুও নহে কিন্তু সেই সকলের অন্তর্নিহিত ভিত্তিস্বরূপ এক সদ্বস্তু। আত্মাই দ্রষ্টা, স্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ ; এবং মস্তিষ্ক প্রভৃতি তাহার জ্ঞানদ্বার মাত্র। আত্মা বিষয়ী, অবভাস সকল বিষয়। আত্মা নিত্য, অবভাস প্রভৃতি ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অবভাসও (ঐহিক) চলিয়া যায়, কিন্তু আত্মার বিনাশ নাই—আত্মা অবিনশ্বর।

আত্মজ্ঞান সম্ভব কি না।

আত্মা সম্বন্ধে এতগুলি বিষয় জানিলাম এবং যদিও আত্মজ্ঞান এক আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্য, তথাপি হার্বার্ট স্পেন্‌সর-প্রমুখ অজ্ঞেয়বাদীগণ বলেন যে আমরা আত্মার বিষয় একেবারে কিছুই জানিতে পারিব না। তাঁহাদের যুক্তি এই যে জ্ঞানমাত্রেরই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় চাই। আত্মা যদি জ্ঞাতা হয়, তবে জ্ঞেয় হইতে পারিবে না এবং যদি জ্ঞেয় হয়, তবে জ্ঞাতা হইতে পারিবে না। কিন্তু আত্মজ্ঞান বলিলেই যখন আত্মাকে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই স্বীকার করিতে হয়, তখন (স্পেন্সরের মতে) আত্মার প্রকৃত অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, কারণ একই বস্তুর জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় হওয়া অসম্ভব। এইতো স্পেন্‌সরের যুক্তি। এই যুক্তির মূলসূত্র দুইটী (১) জ্ঞানমাত্রেরই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় চাই ; (২) জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় একবস্তু

হইতে পারিবে না। স্পেন্সর মনে করিয়াছেন যে দুইটীই প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু তাহা নহে—একটী প্রাকৃতিক নিয়ম, অপরটী তাঁহারই কল্পিত নিয়ম; দ্বিতীয় নিয়মটী তাঁহারই কল্পিত এবং তাহা সত্য নহে। আত্মাকে যে আমরা জানিতে পারি অর্থাৎ আত্মা যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই হইতে পারে, ইহা একটী আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্য। এই সত্যকে না বুঝিয়া তর্ক করিবার চেষ্টা করাতে স্পেন্সরকে পরস্পর-বিরোধী বাক্যজালে জড়িত হইতে হইয়াছে। আত্মার অস্তিত্বপ্রমাণকালে তাঁহার যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেই দেখি যে তাঁহার মতে ঘোর সংশয়বাদীও আত্মার অস্তিত্বে প্রত্যয় করিতে বাধ্য। তিনি অনেকস্থানে এই ভাবে বলিয়াছেন যে ব্যক্তিগত অস্তিত্ব বিষয়ে কেহই সন্দেহ করিতে পারে না। (Personality is the fact, beyond all others, the most certain). কোন্ বিষয়ে আমরা প্রত্যয় করিতে বাধ্য হই? কোন্ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ থাকে না? যে বিষয় আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, তাহাই আমরা প্রত্যয় করিতে বাধ্য। আকাশ-কুসুমকে কে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে? সুতরাং আত্মার অস্তিত্বে ("reality of the individual mind") যখন আমরা প্রত্যয় করিতে বাধ্য তখন তাহার অর্থই এই যে আমরা তাহার বিষয়ে বিশেষরূপ জানি। এইখানে স্পেন্সর ইহা প্রকারান্তরে বলিতেছেন যে, আমরা আত্মাকে নিশ্চয়ই জানিতে পারি; আবার অন্যত্র বলিতেছেন যে আমরা আত্মার সম্বন্ধে একেবারে কিছুই জানিতে পারি না। সুতরাং আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে তাঁহার তর্কপ্রণালীতে ভ্রম আছে। আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এক হইতে পারে কি না, ইহাই হইল প্রশ্ন; কিন্তু তিনি

স্পেন্সরের যুক্তি-খণ্ডন।

প্রারম্ভেই বলিয়া দিতেছেন যে তাহা হইতে পারে না। এইখানেই তর্কে (Petitio principi) অসিদ্ধসাধন নামক দোষ আসিতেছে। অতএব আত্মজ্ঞান যে হয়, ইহা অস্বীকার করিবার কোনই কারণ দেখিতেছি না। বরঞ্চ অনাত্মবিষয়ক জ্ঞান অপেক্ষা আত্মজ্ঞানই আমাদের অন্তরে অধিকতর প্রকাশিত হয়। আমাদের অনুভূতি সত্য না হইতে পারে, শুক্তিতে রজতভ্রম হইতে পারে, কিন্তু তাহার মধ্যে একমাত্র আমিত্বজ্ঞানই অভ্রান্তভাবে বর্ত্তমান। আমার আত্মাকে কখনও অপরের আত্মা বলিয়া ভ্রম করি না। সূর্য্য যেমন অন্যকেও প্রকাশ করে এবং আপনাকে অধিকতর প্রকাশ করে সেইরূপ আত্মজ্ঞান অন্য সকল জ্ঞানের মূলে থাকিয়া তাহাদিগকে প্রকাশ করে এবং আত্মাকে অধিকতর পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত করে। আমরা শরীরকেও ভালরূপে জানি না; তাহার কত পরমাণু-পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, সেই সকল কিছুই ভালরূপে জানিতে পারি না; আত্মাকেই আমরা একমাত্র সর্ব্বাঙ্গীন জানিতে পারি, কারণ, তাহার চিন্তা প্রভৃতি যাহা কিছু অবভাস হয়, তাহা সমস্তই জানি—আমার নিকট লুকাইয়া তাহার কোন কার্য্যই হইতে পারে না; এক কথায়—আত্মাই আমি, আমিই আত্মা।

আমরা আত্মা ও আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়া দেখিলাম। অজ্ঞেয়বাদীগণ আত্মা সম্বন্ধে অজ্ঞেয়তাকে ঈশ্বর সম্বন্ধে অজ্ঞেয়তার ভিত্তি করেন। এই কারণে ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনার পূর্ব্বে আত্মজ্ঞান আলোচনা করিয়া তাঁহাদের তর্কভিত্তি যুক্তিহীন দেখিয়া লইলাম। এখন আমরা ক্রমে ক্রমে দেখিব যে আমরা আত্মপ্রত্যয়কে অবলম্বন করিয়া অধ্যাত্মতত্ত্বের চরম লক্ষ্য ব্রহ্মজ্ঞানে কিরূপে আরোহণ করিতে পারি।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ প্রবন্ধে আত্মা অবিনশ্বর নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়—আত্মাই হিরণ্ময় কোষ।

টিণ্ডালের উক্তি।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্তপ্রতাপ চন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রথমবার বিলাত গমন করিয়া যখন অধ্যাপক টিণ্ডালের সহিত সাক্ষাৎ করেন, তখন টিণ্ডাল তাঁহাকে বলিয়াছিলেন এককালে পূর্ব্বদিক্ হইতেই সত্যধর্ম্ম উদিত হইয়াছিল এবং পূর্ব্বদিক্ হইতেই সত্যধর্ম্ম পুনবায় উদিত হইবে "True religion once came from the east, and from the east it shall come again." *

ঋষিপ্রদিষ্টপথ।

সত্যধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথম এই পুণ্যশ্লোক ভারতীয় ঋষিদিগের কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে সর্ব্বপ্রথম সত্যধর্ম্ম প্রচারিত হইবার প্রধান কারণ এই যে ভারতের ঋষিগণ আত্মপ্রত্যয়কে পরিত্যাগ না করিয়া, প্রত্যুত তাহাকেই অবলম্বন করিয়া অধ্যাত্মতত্ত্বের অন্বেষণে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আত্মপ্রত্যয় তাঁহাদিগকে বলিল যে আত্মা আছে, আত্মা আপনাকে আপনি জানিতে পারে; তাঁহারাও সেই আত্মপ্রত্যয়কেই অবলম্বন করিয়া আত্মার স্বরূপ জানিতে কৃতকার্য্য হইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। আত্মপ্রত্যয় তাঁহাদিগকে বলিয়া দিল যে ভূমা ঈশ্বর আছেন; তাঁহারাও তাহা অবিশ্বাস না করিয়া, অস্বীকার না করিয়া সেই আত্মপ্রত্যয়েরই অবলম্বনে তাঁহার স্বরূপ জানিতে গিয়া যে সকল আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ অমূল্য সত্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, আজিও সেই সত্য সকল মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদের যশো-

* The Interpreter. Edited by P. C. Mozoomder November 1883. p. 74.

কীর্ত্তন করিতেছে। পরে যখন আর্য্যেরা তাঁহাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষ ঋষিদিগের প্রদর্শিত পথের বিপরীতে চলিয়া, আত্মপ্রত্যয়কে যে পরিমাণে অবহেলা করিতে লাগিলেন, সেই পরিমাণে ভ্রান্ত-মত, উপধর্ম্ম প্রভৃতি প্রচার হইতে লাগিল। আমাদিগের আশা আছে যে আমরা আবার বৈদিক ঋষিপ্রদিষ্ট পথ আত্মপ্রত্যয়কে অবলম্বন করিয়া পুনরায় জগতে সত্যধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিব এবং টিণ্ডালের ন্যায় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতের নিকট হইতেও এই আশার প্রতিধ্বনি পাইতেছি।

ব্রহ্মতত্ত্বে আত্ম-প্রত্যয়।

আমরা পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিতেছি যে একমাত্র আত্মপ্রত্যয়ই অধ্যাত্মতত্ত্বে পৌঁছিবার প্রকৃষ্ট উপায়। পূর্ব্ব প্রস্তাবে আমরা ইহাও দেখিয়া আসিয়াছি যে আত্মা ও আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে যে সকল কথা আত্মপ্রত্যয়কে অবলম্বন করিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়, কুতর্ক পরিত্যাগ করিয়া যুক্তিযুক্ত বিচারপ্রণালীর দ্বারা সেই সকল সত্য বলিয়াই পোষকতা প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান প্রস্তাবে আমরা দেখিব যে ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও আত্মপ্রত্যয় যে সকল কথা বলিয়া দিবে, সে সকলও সত্য—কেবলি কল্পনা নহে।

ব্রহ্মজ্ঞান আত্ম-প্রত্যয়সিদ্ধ সত্য।

আত্মজ্ঞান বা আপনাকে জানিতে পারা যেমন একটী আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্য, ব্রহ্মজ্ঞানও সেইরূপ আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ একটী সুমহান্ সত্য। আত্ম-প্রত্যয় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছে যে ব্রহ্ম-সত্তা সর্ব্বাপেক্ষা সত্য এবং মহত্তম সত্য। সুতরাং আমাদের ইহা বলিবার বিশেষ অধিকার আছে যে ব্রহ্মের যদি প্রকৃত অস্তিত্ব থাকে, এবং যদি তিনি সকল সত্যের মূল পরম সত্য হয়েন, তাহা হইলে আমরা কি বহির্জগতে, কি অন্তর্জগতে সর্ব্বত্র

তাঁহার কোন না কোনও প্রকার পরিচয় পাইবই। ভৌতিক জগতের একটী সত্যকে দৃষ্টান্ত ধরা যাউক্। মাধ্যাকর্ষণ (যে শক্তিবলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পরমাণু পরস্পরকে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে আকর্ষণ করিতেছে) ভৌতিক জগতের একটী সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য। যখন এই সত্য প্রথম আবিষ্কৃত হইল, তখন ইহা সত্য বলিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই—ইহা এইরূপ একটি মতমাত্র ছিল যে পরমাণু সকলের মধ্যে—তাহারা জ্বলন্ত আকারে সূর্য্যের মধ্যেই থাক্, গ্রহগণের মধ্যে থাকিয়া ঘুরিতে থাক্, বায়ুতে ভাসমান থাক্ বা প্রাণীগণের দেহযন্ত্রেই থাক্,—একটী নিয়মিত আকর্ষণশক্তি আছে। ক্রমে পরীক্ষিত হইল যে এই সত্যের কোথাও ব্যতিক্রম নাই। মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম সত্য বলিয়া তাহার পরিচয় সর্ব্বত্র পাওয়া গেল। গ্রহদিগের পরিভ্রমণে, উপগ্রহদিগের পরিভ্রমণে, পৃথিবীতে বস্তু সকলের পতনে, বিষুব বৃত্ত ও কেন্দ্রবর্ত্তী স্থানে ভারের তারতম্যে, সমুদ্রগর্ভে চাপের আধিক্যে এইরূপ নানা ঘটনায় মাধ্যাকর্ষণরূপ সত্যনিয়মের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তবেই দাঁড়াইতেছে যে মাধ্যাকর্ষণের মতটি আমরা যে কোন উপায়েই হউক্ পাইয়াছিলাম; তাহার পর পরীক্ষা দ্বারা তাহাকে সত্য বলিয়া স্থির করিলাম। সেইরূপ আমরা জানিতেছি অথবা আমাদের ধারণা হইতেছে (আত্মপ্রত্যয় অবলম্বনেই হউক্, বা অন্য কোন উপায়ে হউক, তাহা দেখিবার এখন প্রয়োজন নাই) যে, ঈশ্বর আছেন এবং তিনিই সকল সত্যের মূলাধার; তিনি সত্যের প্রস্রবণ, পরম সত্য। আমাদিগের এখন পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে এই ধারণা কি কেবলই কল্পনা অথবা ইহা সত্য। আমরা যে সকল বিষয়ের জ্ঞানলাভ করি, সেই সকলেতেই দেখিতে হইবে,

তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায় কি না। ঈশ্বরকে যখন সকল সত্যের মূল বলিতেছি, তখন আমাদিগের জ্ঞানের একটি অঙ্গ ধরিয়া দেখিলে চলিবে না—জ্ঞানের সকল অঙ্গের মধ্যেই তাঁহার পরিচয় লইতে হইবে।

ঈশ্বর পূর্ণায়ত্ত নহেন বলিয়া তাঁহার অস্তিত্ব অস্বীকার্য্য নহে।

এইস্থানে একটি কথা বলিয়া রাখিতেছি যে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ রূপে ধারণা করিতে পারি না অথবা তিনি যে সকল নিয়মে জগতকে নিয়মিত করিতেছেন, তাহার সকল গুলি জানিতে পারি না বলিয়াই যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিব, তাহা হইতেই পারে না—তাহা নিতান্তই বাতুলতা। মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম জগতে কার্য্য করিতেছে দেখিতেছি এবং এই কারণেই তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছি। কিন্তু এই নিয়ম যে কেন এইরূপ কার্য্য করিতেছে, কি প্রণালীবলে এই নিয়ম রক্ষিত হইতেছে, আর এই শক্তিই বা কি, এই সকল বিষয় গভীর রহস্যময়; এক গ্রহের পরমাণু অপর গ্রহের পরমাণু হইতে সহস্র সহস্র ক্রোশ ব্যবধানে থাকিলেও কোন প্রকার জড়ীয় অবলম্বন ব্যতীত যে আকর্ষণ করে কিরূপে, তাহা আমাদের চিন্তার অতীত। তথাপি এই শক্তিকে কার্য্য করিতে দেখিয়া, জড়জগতে তাহার পরিচয় পাইয়া, স্বীকার করিতেছি যে এই শক্তি নিশ্চয়ই আছে। সেইরূপ ঈশ্বর কি শক্তিবলে এই জগতকে নিয়মিত করিতেছেন, বা তাঁহার স্বরূপ কি, এই সকল বিষয় সম্পূর্ণরূপে ধারণা করিতে না পারিলেও যদি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র তাঁহার পরিচয় পাই, তাঁহার হস্ত দেখিতে পাই, তাহা হইলেই আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য হইব যে পরমাত্মা নিশ্চয়ই আছেন এবং তিনি সকল সত্যের মূলাধার পরম সত্য। আমাদের বুদ্ধি তাঁহাকে ধারণা করিতে

গিয়া নিরস্ত হউক্, তাঁহার "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া" সম্পূর্ণ-রূপে আমাদের বুদ্ধির আয়ত্ত নাই হউক্; কিন্তু তথাপি কনক-কিরণরঞ্জিত প্রভাতগগন তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে ক্ষান্ত থাকিবে না, গভীর নিশীথে ব্যাকুলচিত্ত সাধকের নিকট অগণ্য গ্রহনক্ষত্র ছন্দে ছন্দে নৃত্য করিয়া ঈশ্বরকে প্রকাশ করিতে বিরত থাকিবে না এবং সমগ্র মানবমণ্ডলীর আত্মা হইতে চিরকালই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মহাসঙ্গীত ধ্বনিত হইতে থাকিবে।

আমাদের জ্ঞানের কয় প্রকার অঙ্গ।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে আত্মার জ্ঞানের যত প্রকার অঙ্গ আছে, সকল অঙ্গের মধ্যেই ঈশ্বরের পরিচয় লইতে হইবে। সুতরাং আত্মজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া প্রথমেই আমাদিগের দেখিতে হইবে যে আমাদের জ্ঞানের কয় প্রকার অঙ্গ আছে। আত্ম-জ্ঞানের দ্বারা আমরা আমাদের আত্মার জ্ঞানের প্রধানত চারি প্রকার বিভাগ দেখিতে পাই।

(১) ইচ্ছাশক্তি।

(১) ইচ্ছাশক্তি; আমরা জানি যে আমরাই ইচ্ছা করি এবং সেই ইচ্ছানুসারে কার্য্যও করি। আমরা ইচ্ছানুসারী যত্ন ও চেষ্টাকে কারণ বলিয়া বুঝিতে পারি, যে হেতু কার্য্যপরম্পরাকে সেই কারণের অনুসরণ করিতে দেখি; এইরূপে বুঝিতে পারি যে আমাদের কৃত কার্য্যের প্রকৃত কারণ আমাদের ইচ্ছা।

(২) প্রজ্ঞা।

(২) প্রজ্ঞা; আমরা এই জ্ঞানের বলে শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে প্রভেদ বুঝিতে পারি। ইহারই বলে আমরা একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে যত্ন করি; বস্তু সকলের বিভিন্ন অঙ্গ সংস্থানের মধ্যে সামঞ্জস্য অনুভব করিতে পারি; এক

কথায়, সচরাচর যে সকল কার্য্যকে জ্ঞানের কার্য্য বলে তাহা এই প্রজ্ঞাবলেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে আমাদের এক প্রজ্ঞাবল আছে, যাহা ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখে, উদ্দেশ্য স্থির করে ইত্যাদি।

(৩) নীতিজ্ঞান।

(৩) নীতিজ্ঞান; আমরা জানি যে আমাদের অন্তরে ন্যায় ও অন্যায়ের ভাব দৃঢ়রূপে মুদ্রিত আছে। যাহা কর্ত্তব্য, কে যেন বলিয়া দেয় যে, তাহা করিতেই হইবে এবং যাহা অকর্ত্তব্য তাহা পরিত্যাগ করিতেই হইবে। কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিলে যে আত্মপ্রসাদ হয় এবং অন্যায় কর্ম্ম করিলে যে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। আমরা যতক্ষণ আপনাদিগকে মনুষ্যনামে অভিহিত করিব, ততক্ষণ মনুষ্য পদের দায়িত্বও পরিত্যাগ করিতে পারিব না; আমরা সৎকর্ম্মের প্রশংসাও যেমন না করিয়া থাকিতে পারিনা, সেইরূপ অসৎ কর্ম্মকেও ঘৃণা না করিয়া থাকিতে পারি না। এইরূপে আমরা জানি যে আমরা সদসৎ বিবেচনারহিত, দায়িত্বহীন জীব নহি, প্রত্যুত আমরা নীতিজ্ঞানবিশিষ্ট দায়িত্ববিশিষ্ট মনুষ্য।

(৪) শ্রদ্ধা।

(৪) শ্রদ্ধা; আমরা জানি যে আমাদের আত্মাতে একটী শ্রদ্ধাভাব আছে। এই ভাব থাকাতেই আমরা সীমাবদ্ধ পার্থিব কোন বস্তুতে, কোন ভাবে, কোন জ্ঞানে, সন্তুষ্ট না হইয়া সকলের আশ্রয়স্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, পরিপূর্ণ পরম পিতার সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতে উদ্‌যুক্ত হই। এই শ্রদ্ধাভাবই মানবাত্মার উন্নততম অধিকার। ইহাই শিক্ষা দেয় যে আমরাও সেই শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপের সন্তান এবং এই ভাব থাকাতেই আত্মাতে ঈশ্বরের পবিত্র মূর্ত্তি প্রতিফলিত হইয়া

থাকে। এই ভাব থাকাতেই আমরা জানিতেছি যে আমরা কেবলই পৃথিবীর জীব নহে; আমরা লোক হইতে লোকান্তরে গমন করিয়া, উন্নতি হইতে অধিকতর উন্নতি লাভ করিয়া ঈশ্বরেরই মহিমা অধিকতর উৎসাহের সহিত ঘোষণা করিতে পারিব।

এইরূপে দেখিতেছি মানবাত্মার জ্ঞানকে স্থূলত চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এই চারি অঙ্গ সকল মনুষ্যেই যে সমানভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে তাহা নহে; উন্নত সুসভ্য সাধু ব্যক্তির হৃদয়ে এই চারি অঙ্গ যেরূপ উজ্জলভাবে প্রকাশ পাইবে দক্ষিণ আমেরিকার প্রান্তবাসী অসভ্য মনুষ্যের হৃদয়ে কখনই সেরূপ উজ্জলরূপে প্রকাশ পাইবে না। কিন্তু সকল মনুষ্যেরই হৃদয়ে জ্ঞানের এই চারি অঙ্গের বীজ প্রোথিত থাকিবেই। আদিম মানবের হৃদয়েও এই চতুর্ব্বিধ জ্ঞানের বীজ প্রোথিত ছিল *; কিন্তু তাহাদের নিকট এই চতুর্ব্বিধ জ্ঞানের পূর্ণাবয়ব অন্বেষণ করিতে যাওয়া বৃথা। সুবৃহৎ বটবৃক্ষের গুণাবলী জানিতে বটবীজের নিকটে যাইলে নৈরাশ্য মাত্র লাভ হয়।

আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের সোপান। কারণবাদ।

মানবাত্মা আপনার জ্ঞানের চারি অঙ্গকে অবলম্বন করিয়া পরমাত্মাকে প্রধানতঃ চারিভাবে উপলব্ধি করে। (১) আমরা ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান ইচ্ছাময় পুরুষ বলিয়া জানি। তিনি ইচ্ছা করিয়াই এই বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করিয়া এবং নিয়মিত করিয়া স্বীয় মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধন করিয়া লইতেছেন। জগতের স্রষ্টা ও পাতারূপে ঈশ্বর স্বীকার করাকে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ কারণবাদ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

* ইহার বহুল প্রমাণ আছে; কিন্তু সেগুলি এখানে উদ্ধৃত করা অযথা হয়, কারণ এই কথাগুলি এই প্রসঙ্গের পক্ষে অবান্তর কথা মাত্র।

(২) আমরা যখন বিশ্বশিল্পের অন্তরালে বুদ্ধির দ্বারা অনুসন্ধানে কৌশল পরম্পরাকে কার্য্য করিতে দেখি, তখন স্বভাবতঃই আমরা সেই বিশ্ব-রচয়িতাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া জানিতে পারি। তখন আমরা স্পষ্টই বুঝিতে পারি যে তিনি "সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" তিনি সকল ঘটনা, সকল বিষয় সাধারণ ভাবেও জানেন এবং বিশেষ ভাবেও জানেন; তিনিই সকল প্রকার জ্ঞানের চরম সীমা। তিনিই উপযুক্ত ব্যবস্থা দ্বারা প্রত্যেকের যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন "যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ। এইরূপে জগতের মধ্যে কৌশল দেখিয়া ঈশ্বরকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি করাই পাশ্চাত্যদিগের প্রজ্ঞাবাদ (Argument from Design)

প্রজ্ঞাবাদ।

(৩) আমরা যখন পবিত্র থাকিবার, সুপথে চলিবার উপদেশ সর্ব্বদাই আত্মাতে অনুভব করি তখন সেই উপদেশদাতা পরমগুরুকেও পবিত্র-স্বরূপ "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপ বলিয়া জানিতে পারি। তখন আমরা ইহাও বুঝিতে পারি তিনি পরিপূর্ণ ন্যায়-স্বরূপ—তাঁহার এই স্বরূপ হইতে কদাপি বিচ্যুতি নাই। এইরূপে আমাদের পবিত্র ভাব হইতে পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরের উপলব্ধি করাকে আমরা নীতিবাদ বলিয়া অভিহিত করিব।

নীতিবাদ।

(৪) আমরা যখন আপনাদিগকে তাঁহার সন্তান বলিয়া জানিতে পারি তখন তাঁহাকেও আমাদের পিতা বলিয়া জানিতে পারি। তখন তাঁহাকে পিতা বলিয়া, করুণাময়ী মাতা বলিয়া, প্রেমময় সখা বলিয়া ডাকিতে থাকি। তখন তাঁহাকে অনন্ত প্রেমের পরিপূর্ণ উৎস

শ্রদ্ধাবাদ।

বলিয়া অনুভব করিতে পারি। এই অবস্থাই মানবাত্মার উন্নত-তম অবস্থা।* এই অবস্থাই অধ্যাত্মধর্ম্মের সুপ্রশস্ত পত্তন ভূমি। এই অবস্থা ক্ষণিক না হইয়া স্থায়ী হইলেই আত্মা চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিল—তাহার অধ্যাত্মযোগ সংসিদ্ধ হইল। এইরূপে আমাদের আধ্যাত্মিক ভাব হইতে ঈশ্বরের পিতৃত্ব উপলব্ধি করাই ব্রহ্মবাদ।

আত্মজ্ঞানের যোগানে ব্রহ্মদর্শন মানবীকরণ নহে।

এখন দেখিলাম যে আত্মা স্বীয় জ্ঞানের চারি ভাগকে অব-লম্বন করিয়া ঈশ্বরকে চারি প্রকারে উপলব্ধি করে। কেহ কেহ এই প্রকারে ঈশ্বর উপ-লব্ধি করাকে মানবীকরণ বলিয়া উপহাস করিবেন। আমরা কিন্তু ইহাকে মানবী-করণ বলিতে পারিব না। বিরুদ্ধবাদীগণ বলেন যে আমাদের যে চতুর্ব্বিধ জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানের সহিত মিলিত মনুষ্য-ভাবকে বৃহৎ বা ভূমারূপে কল্পনা করিয়া সেই বৃহৎ মনুষ্যের নাম দিই ঈশ্বর। আমরা বলিতেছি যে ঈশ্বরকে আমরা বৃহৎ মনুষ্য রূপে কল্পনা করি না কিন্তু ইহা জানি যে আমাদের আত্মায় যে সকল শক্তি আছে, সেই সকল শক্তি ঈশ্বরেতে অনন্তগুণ অধিক-রূপে বর্ত্তমান আছে। এমনও হইতে পারে যে আমাদের আত্মার শক্তি হইতে ঈশ্বরের আরও অনেক বিভিন্ন প্রকারের শক্তি আছে কিন্তু সেই সকল শক্তির বিষয় আমরা কিছুই জানিতে পারিব না। আমরা আমাদের জ্ঞানের সীমা কিছুতেই অতি-ক্রম করিতে পারিব না। দেবলোকে গিয়া আমরা যদি কোন অতিরিক্ত শক্তি লাভ করি, তখন আবার সেই শক্তিকে অবলম্বন করিয়া আর এক নূতন ভাবে ঈশ্বরের পরিচয় পাইব। আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গণের কার্য্য জানিতে পারি বলিয়াই অন্যান্য

ব্যক্তিরও ইন্দ্রিয়কার্য্য উন্নত হউক বা অনুন্নত হউক, জানিতে পারি। কিন্তু অন্যান্য ব্যক্তিকে আমাদের অপেক্ষা কোন অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করিতে পারি না, অথবা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয় আমরা কিছুতেই বুঝিতে পারিব না; আমাদের যে সকল ভাব আছে, জ্ঞান আছে, বৃত্তি আছে কোন জীবে সেই সকল বৃত্তি অধিক বা অল্প পরিমাণে আছে ইহা অনায়াসে কল্পনা করিতে পারি, কিন্তু আমাদের জ্ঞানবৃত্তি হইতে বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞানবৃত্তিবিশিষ্ট জীব কিছুতেই ধারণা করিতে পারি না। ইহার কারণ এই যে জ্ঞান, যতই কেন উচ্চ সীমাতে আরোহণ করুক না, তাহার নিজের অভিজ্ঞতা ব্যতীত অন্য কোথাও হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারে না। এই কারণেই আমরা বলিতেছি মানবাত্মার মধ্য দিয়া ঈশ্বরকে জানিলেই তাহা মানবীকরণ হইল না। আমরা জানি যে ঈশ্বরের যে সকল শক্তি আছে, তন্মধ্যে অন্ততঃ কতকগুলি তিনি মানবাত্মার অন্তরে নিহিত করিয়া দিয়াছেন সুতরাং মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার অন্ততঃ কতকাংশে বস্তুগত সাদৃশ্য আছে। আর যখন ভূমাস্বরূপের প্রতি মানবাত্মার এক গভীর আকাঙ্ক্ষা দেখিতে পাই, এবং যখন দেখি জগতে তৃষ্ণা ক্ষুধা প্রভৃতি নানা আকাংক্ষার তৃপ্তির উপায় রহিয়াছে, তখন সেই আকাংক্ষারই কি একমাত্র তৃপ্তির উপায় থাকিবে না? বরঞ্চ এই আকাংক্ষা সেই ভূমাপুরুষের অস্তিত্বের পক্ষেই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ বিরচিত অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ প্রবন্ধে আত্মার হিরণ্ময় কোষ নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়—ব্রহ্মতত্ত্বে কারণবাদ।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি যে আত্মা স্বকীয় চারি প্রকার শক্তি বা জ্ঞানবিভাগকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরকে চারি প্রকারের উপলব্ধি করে অর্থাৎ আত্মা স্বীয় চতুর্ব্বিধ জ্ঞানবিভাগেই ঈশ্বরের পরিচয় প্রাপ্ত হয়। অধ্যাত্মবাদীগণ যদিও এই পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করেন যে তাঁহারা ঈশ্বরের পরিচয় পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগের কেবল মাত্র বলিলেই হইবে না যে তাঁহারা নিজে পরিচয় পাইয়াছেন; তাঁহাদের দেখা কর্ত্তব্য যে জ্ঞানের উক্ত চারি অঙ্গের মধ্য দিয়া ঈশ্বর যে স্বপ্রকাশ হয়েন অন্যের নিকটে তাহার কি সাক্ষ্য প্রদান করিবেন—কি প্রমাণ দিবেন? এই প্রমাণের বিষয় বুঝিতে গেলে আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত কারণবাদ, প্রজ্ঞাবাদ, নীতিবাদ এবং শ্রদ্ধাবাদ এই চারিটী বিষয় একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

কারণবাদ।

প্রথমতঃ আমরা কারণবাদ লইয়া আলোচনা করিব। এই কারণবাদের আলোচনা কালেও আত্মপ্রত্যয়কে ছাড়িলে চলিবে না। আমরা ইহাও দেখাইতে চেষ্টা করিব যে অজ্ঞেয়বাদীগণ আত্মপ্রত্যয়কে পরিত্যাগ করিয়া যেমন আত্মস্বরূপ নির্ণয়ে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, সেইরূপ আত্মপ্রত্যয়কে ছাড়িয়া ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণয়েও অক্ষম হইয়াছেন। আমরা দেখিব যে ঈশ্বর আত্মপ্রত্যয়েই কি সুন্দর প্রকাশিত হয়েন এবং সুন্দর ব্রহ্মাণ্ড এই বিষয়ে কেমন এক বাক্যে সাক্ষ্য প্রদান করে।

কার্য্যকারণতত্ত্বে বিশ্বাস।

আমরা দেখিয়াছি যে আমাদিগের বহির্জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস কিম্বা নিজের আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস কঠোর প্রামাণিক তর্কসিদ্ধ নহে। এই সকল আমরা আত্মপ্রত্যয়ের বলেই বিশ্বাস করি অর্থাৎ ইহাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না, এই কারণেই বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই। সেইরূপ কার্য্য সংঘটিত হইতে দেখিলে তাহার কারণ অনুমান করাও আত্ম-প্রত্যয়সিদ্ধ বিশ্বাস। আমি জানি যে আমি যদি একটী বৃক্ষ রোপণ করি, তাহার কারণ হইবে আমার ইচ্ছা। সেইরূপ যদি দেখি যে আর একটী বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে, যাহা আমি রোপণ করি নাই, তখন বুঝিব যে অপর এক ব্যক্তির ইচ্ছাই বৃক্ষ রোপণ করিবার পক্ষে কারণ। এই অপর ব্যক্তির ইচ্ছার কারণত্বে বিশ্বাস আমরা তর্কশাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া প্রাপ্ত হই নাই—ইহা স্বতঃসিদ্ধ। যখনই এমন কোন কার্য্য দেখি, যাহা আমাদিগের কৃতকার্য্যের অনুরূপ অথচ আমাদিগের কৃত নহে, তৎক্ষণাৎ আমরা স্থির করি যে ইহা আমাদিগের ন্যায় কোন মনুষ্যের রচিত। কিন্তু এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে এমন অনেক পদার্থ দেখিতে পাই, যাহা নিশ্চয়ই মানবের হস্তরচিত নহে এবং যাহাতে মানবের বুদ্ধির অগম্য কৌশলপরম্পরা কার্য্য করিতেছে ; এই সকল দেখিয়া আমরা সহজেই বিশ্বাস করি যে এই গুলি ঈশ্বরেরই ইচ্ছাপ্রসূত। অন্য ব্যক্তির আত্মার অস্তিত্বে যেমন সহজে বিশ্বাস করি, ঈশ্বরেরও অস্তিত্বে সেইরূপ সহজে বিশ্বাস করি। এই বিশ্বাস যে সহজেই আত্মাতে স্থান পায়, তাহা প্রমাণ করিবার জন্যই যেন, ফরাসি বিপ্লবের ঘোর নাস্তিক যুগের কতকগুলি ফরাসি নাস্তিক যুবক নেপোলিয়ন বোনাপার্টের

সম্মুখে যে রাত্রিতে ঘৃণিত নাস্তিকতা প্রচার করিতেছিল, সেই সময়ে নেপোলিয়ন নক্ষত্রখচিত মুক্ত আকাশের দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া সহসা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিন্তু কে এই সকল সৃষ্টি করিলেন ?"

মানবাত্মা ভৌতিক কারণে তৃপ্ত নহে।

আমরা দেখিলাম যে কার্য্যের কারণ অনুমান করা আমাদিগের স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু যে সকল 'কার্য্য' পদার্থ আমরা ঈশ্বর-সৃষ্টি বলিতেছি, সেই সকল পদার্থের কারণ লইয়াই অধ্যাত্মবাদী ও অজ্ঞেয়বাদীর বিবাদ। অধ্যাত্মবাদী বলেন যে সেই সকল পদার্থের স্রষ্টা ও কারণ ঈশ্বর এবং অজ্ঞেয়বাদী হয়তো সেই সকল পদার্থের কোন ভৌতিক কারণ নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। অজ্ঞেয়বাদী এইখানে সহজজ্ঞানের বিপরীতে জড়পদার্থকে কারণ বলিয়াই ভ্রমে পড়িয়াছেন। জড়পদার্থ কখন প্রকৃত কারণ হইতে পারে না। বাষ্প হইতে মেঘ হইল, মেঘ হইতে বৃষ্টি হইল। এখানে বাষ্প মেঘের কারণ নহে এবং মেঘও বৃষ্টির কারণ নহে; কিন্তু বাষ্প, মেঘ ও বৃষ্টি এই তিনটী 'কার্য্য' পদার্থ ক্রমান্বয়ে সংঘটিত হইয়াছিল। বাষ্প মেঘের এবং মেঘ বৃষ্টির ভৌতিক কারণ বলিয়া উক্ত হয় বটে অর্থাৎ প্রকৃত কারণ নহে; আমরা কেবল সুবিধার জন্য অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাকে কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি মাত্র। কিন্তু মানবাত্মার স্বভাবই এরূপে গঠিত যে সে ভৌতিক কারণে তৃপ্ত থাকিতে চাহে না—প্রকৃত কারণ অন্বেষণ করে। আমি যষ্টি দ্বারা এক ব্যক্তিকে প্রহার করিলাম; এখন বিচারক কাহাকে দোষী করিবেন? ব্যক্তিকে প্রহার সম্বন্ধে সাক্ষাৎ ভৌতিক কারণ যষ্টিখানি। কিন্তু এই যষ্টি প্রকৃতপক্ষে কারণ নহে বলিয়া বিচা-

রক তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করেন না এবং শাস্তিও প্রদান করেন না। ক্রমে বিচারক দেখিলেন যে অঙ্গুলিও কারণ নহে, আর শরীরও কারণ নহে—যে হেতু ইহারা জড় পদার্থ মাত্র। অবশেষে যখন তিনি অন্বেষণ করিলেন যে কে এই সকল জড় পদার্থকে প্রহার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিল, তখন তিনি জানিলেন যে আমার ইচ্ছাই এইরূপ নিযুক্ত করিয়াছিল এবং তিনি তাহা-কেই প্রকৃত দোষী সাব্যস্ত করিলেন। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা আমরা স্পষ্টই জানিতেছি যে মানবাত্মা যেমন ভৌতিক কারণে তৃপ্ত না হইয়া প্রকৃত কারণ জানিতে চাহে, সেইরূপ তাহার সহজ জ্ঞানের দ্বারা ইচ্ছাকে বা ইচ্ছাময় পুরুষকেই (ইচ্ছা কখন শূন্যে শূন্যে থাকিতে পারে না) প্রকৃত কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হয়। আমাদের ইচ্ছারূপ কারণই প্রকৃতপক্ষে কার্য্য সকল প্রসব করে। আমাদের কৃত সকল কার্য্যের এক মাত্র ইচ্ছাই প্রকৃত কারণ বলিয়া আমাদের দায়িত্ব আছে; এই দায়িত্বজ্ঞানই ইচ্ছার কারণত্বের এক প্রধান প্রমাণ।

ইচ্ছাই প্রকৃত কারণ।

ইচ্ছাই প্রকৃতপক্ষে সকল কার্য্যের কারণ এই আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া, এখন আমরা জগৎকার্য্যের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিব। এই জগতে নানা জটিল কৌশল-বিশিষ্ট ভৌতিক কার্য্য সমূহ ঘটিতে দেখি। আমাদিগের স্বভাবতই কারণ-জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয় এবং জিজ্ঞাসা করি যে এই সকল কার্য্য কে করাইতেছে। বিজ্ঞান প্রতি কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী আর একটী কার্য্যকে কারণ, আবার তাহার

অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী আর একটী কার্য্যকে তাহার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে থাকেন। এইরূপে বিজ্ঞান কার্য্য হইতে কার্য্যান্তরে গিয়া অবশেষে সৃষ্টিবাষ্পে (Cosmic vapour) অবতরণ করিয়া বলেন যে এই বাষ্পই সৃষ্টির মূল কারণ। বিজ্ঞান আজি পর্য্যন্ত এই সীমাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই—এই বাষ্পের কারণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে বিজ্ঞান নীরব। আমরা ইহাতে তৃপ্ত নহি; আমাদের এখনও এই জিজ্ঞাসা রহিয়াছে যে এই সৃষ্টি-বাষ্প আসিল কোথা হইতে। তখন আমাদের সহজ বুদ্ধি দুইটী অনুমান সম্মুখে উপস্থিত করে—(১) হয় এই বাষ্প অনাদি কাল হইতে বর্ত্তমান ছিল অথবা (২) ইহারও কোনও আদি কারণ আছে। যদি এই বাষ্প অনাদি কাল হইতে বর্ত্তমান ছিল, এইরূপ হয়, তাহা হইলে আমরা ইহাও না ভাবিয়া থাকিতে পারি না, যে এই বাষ্প অপর শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত বাষ্পাকারেই থাকিত; কারণ ইহার উপর দিয়া যখন অনাদি অতীত কাল চলিয়া গিয়াও কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিল না, তখন অনন্ত ভবিষ্যৎকালও কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে না; পরিবর্ত্তনের যত কিছু শক্তি ছিল, তাহারা অনাদি কাল হইতেও কার্য্য করিয়া যখন কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারিল না, তখন তাহারা অনন্তকালেই বা কিরূপে পরিবর্ত্তন সাধন করিবে? কিন্তু যখন দেখিতেছি যে এই বাষ্প পরিবর্ত্তিত হইয়া এক সময়ে এই সুন্দর বিশ্বরাজ্যে পরিণত হইতে প্রবৃত্ত হইল, তখন স্পষ্টই বুঝিতেছি যে ইহাও একটি

বিজ্ঞান ভৌতিক কারণ দেখাইয়াই নীরব।

"কার্য্য" মাত্র সুতরাং অনাদি হইতে পারে না, যেহেতু তাহারও কারণ স্বীকার করিতেই হইতেছে। তবেই দেখিতেছি যে সৃষ্টিবাম্পেরও কারণ আছে। এখন প্রশ্ন এই যে, এই কারণটী কি? ইহা ভৌতিক কারণ হইতে পারে না, তাহা হইলে বিজ্ঞান তাহা প্রদর্শন করিত; আর যদি বা বিজ্ঞান তাহা প্রদর্শন করে, তথাপি আমাদিগের প্রশ্ন হইবে যে সেই ভৌতিক কারণের আবার কারণ কি? আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে আমাদিগের আত্মপ্রত্যয় ভৌতিক কারণকে প্রকৃত কারণ বলিয়া স্বীকার করে না। যাহাই হউক, যখন সৃষ্টিবাম্পের কোন ভৌতিক কারণ নাই, অথচ দেখিতেছি যে তাহার নিশ্চয়ই কারণ আছে, তখন এই কারণ কি? পূর্ব্বে ইহাও দেখিয়া আসিয়াছি আমরা আত্মপ্রত্যয়ে ইচ্ছাকেই প্রকৃত কারণ বলিয়া স্থির করিতে বাধ্য হই। সুতরাং এখানেও আত্মপ্রত্যয়কে অবলম্বন করিয়া স্থির করিতে বাধ্য হইতেছি যে সৃষ্টিবাম্পের মূল কারণ এক মহতী ইচ্ছা। ইচ্ছা মানিলেই ইচ্ছাময় পুরুষও স্বীকার করিতে হইবে এবং এই ইচ্ছাময় পুরুষ—যাঁহার ইচ্ছায় জগত সৃষ্ট হইয়া শোভনসাজে সজ্জিত হইয়াছে—সেই ইচ্ছাময় পুরুষকেই আমরা ঈশ্বর বলিয়া জানি এবং তাঁহাকেই ভক্তি ভরে নমস্কার করি।

আত্মপ্রত্যয়ে জগতের অনাদি কারণ স্বীকার।

ইচ্ছাময় পুরুষ জগতের কারণ।

আমরা এত কথা যে বলিয়া আসিলাম, তাহার মধ্যে আমরা জড়জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছি। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে জড়জগতের বাস্তবিক কোন অস্তিত্ব নাই, ইহা কেবল আমাদের অনুভূতি মাত্র অর্থাৎ কোন

প্রত্যেক সসীম জ্ঞানে অসীমের প্রকাশ।

অনির্ব্বচনীয় প্রণালীক্রমে জড়জগতের গুণমাত্র আমাদের জ্ঞানে প্রকাশ পাইতেছে এবং এই কারণে আমরা জড়পদার্থের গুণেরই বর্ণনা করিয়া তাহার পরিচয় দিই। এই কাগজটী কেমন—উত্তরে আমরা বলি যে ইহা কঠিন, ইহা ভারী, ইহা মসৃণ ইত্যাদি। এই কাঠিন্য, ভার, মসৃণতা প্রভৃতি সকল প্রকার গুণই আমাদিগের অনুভূতিময় জ্ঞান মাত্র। সুতরাং তাঁহাদিগের মতে জড়পদার্থ সকল অনুভূতিময় জ্ঞানকণিকার সমষ্টিমাত্র। গুণের আধার জড়পদার্থের বাস্তব সত্তা আছে কি না, আমরা এখন সে বিষয়ে তর্ক করিতে যাইব না। তাঁহাদের কথা স্বীকার করিলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইতে পারে না। এই যে বৃক্ষটী দেখিতেছি ইহা আমার অনুভূতি বা জ্ঞানের একাংশ মাত্র। আমার জ্ঞান না থাকিলে আমার পক্ষে এই বৃক্ষের অস্তিত্ব থাকিবে না। কিন্তু ইহা জানি যে অমুক ব্যক্তি যখন জীবিত ছিল, তখন তাহার পক্ষে এই বৃক্ষের অস্তিত্ব ছিল এবং আজ সে ব্যক্তি পরলোকগত, আজও সেই বৃক্ষের অস্তিত্ব আছে, যদিও তাহার পক্ষে নাই বটে। আবার ইহাও জানিতেছি যে আমার পক্ষে এখন এই বৃক্ষের অস্তিত্ব আছে এবং আমি পরলোকগত হইলেও এই বৃক্ষের অস্তিত্ব থাকিবে। আমি যতক্ষণ সেই বৃক্ষকে দেখিতেছি, ততক্ষণ আমি কতকগুলি অনুভূতি লাভ করিতেছি এবং জানিতেছি যে অন্ততঃ আমার পক্ষে সেই বৃক্ষের অস্তিত্ব আছে এবং যখন সেই বৃক্ষ হইতে দূরে গমন করিয়া তাহাকে না দেখি, তখনও জানি যে যদিও আমি অনুভূতি পাইতেছি না, তথাপি তাহার অস্তিত্ব আছে। এখন, যদি জ্ঞান ব্যতীত জড়পদার্থের সত্তা না থাকে, এবং যখন জানিতেছি যে আমার জীবন ও মৃত্যুর সঙ্গে এই জড়জগত আবির্ভূত ও

তিরোহিত হইবে না, তখন আমাদিগের এক জ্ঞানময় পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে, যাহার সত্তাতেই আমাদের জ্ঞানগত সত্তার অতিরিক্ত জড়জগতের সত্তা বর্ত্তমান থাকে। সেইরূপ অপর মানবাত্মাকে যতটুকু পরিমাণে জানিতে পারি, ততটুকু পরিমাণে ইহা জানি যে আমার জীবন মৃত্যুর উপর অপর মানবাত্মার জীবনমৃত্যু নির্ভর করিতেছে না; সুতরাং এখানেও মানবাত্মা মাত্রেরই অস্তিত্বের জন্য এক সত্যস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ পরমপুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হয়। এক কথায়, প্রত্যেক সীমাবদ্ধ জ্ঞান বা আত্মা অনন্তজ্ঞান পরমাত্মাকে প্রকাশ করে। এই জ্ঞানময় পুরুষকেই আমরা সনাতন ব্রহ্ম নামে ডাকিয়া প্রাণকে শীতল করি।

স্পেন্সরের দুইটী যুক্তি খণ্ডন।

এই খানে আমাদিগকে অজ্ঞেয়বাদীদিগের কুলভূষণ স্পেন্সরের ব্রহ্মজ্ঞান-বিরোধী দুইটী মত বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ, তিনি আদিকারণকে যে ভৌতিক শক্তির সহিত অভিন্ন করিয়া বলেন, তাহাই দেখা যাউক। আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে দেখিয়া আসিয়াছি যে অজ্ঞেয়-বাদীগণ আত্মপ্রত্যয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া নাস্তিকতার দিকেই বেশী ঝুঁকিয়া থাকেন।

১। ভৌতিক শক্তি আদি কারণ নহে।

স্পেন্সারের এই মত তাহার অন্যতম প্রমাণ। জগতের আদি-কারণকে ভৌতিক শক্তির রূপান্তরমাত্র বলিলে তাঁহাকে তো জড় অচেতন বলা হইল। সেই অচেতন শক্তির উপরে আমরা সচেতন হইয়া কেমন করিয়া নির্ভর করিব? আর আমরা দেখিয়াও আসিলাম ইচ্ছা ব্যতীত অন্য কিছুই প্রকৃত কারণ হইতে পারে না; বিজ্ঞান যাহা কিছু ভৌতিক কারণ দেখাইবে,

তাহা জড়পদার্থই হউক, বা অন্য কোন কিছু হউক, তাহা প্রকৃত কারণ হইতে পারে না, তাহা প্রকৃত পক্ষে 'কার্য্য'। এই কার্য্যেরও কারণ অন্বেষণ করিলে যে আমাদিগকে সেই জ্ঞানময় ইচ্ছাময় পুরুষে উপস্থিত হইতে হয়, তাহা বলা বাহুল্য—পূর্ব্বোক্ত প্রমাণাদি দ্বারাই তাহা প্রমাণিত হইবে। সুতরাং স্পেন্সারের এই মতকে অযৌক্তিক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম।

২। ঈশ্বর জগতের নিরবলম্ব কারণ।

তাঁহার দ্বিতীয় কথা এই যে অধ্যাত্মবাদীগণ ঈশ্বরকে নিরবলম্ব বা সম্বন্ধরহিত বলেন এবং পুনরায় তাঁহাকেই জগতের কারণ বা কার্য্য-জগতের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করেন, ইহা নিতান্ত ভ্রান্ত মত। আমরা বলি যে স্পেন্সার অধ্যাত্মবাদীদিগের কথা ঠিক ধারণা করিতে পারেন নাই। অধ্যাত্মবাদীগণ যে বলেন ঈশ্বর নিরবলম্ব তাহার অর্থ এই যে ঈশ্বরের নিরবলম্বত্ব শক্তিগত অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করিলেই নিরবলম্ব হইয়া থাকিতে পারেন। তাই বলিয়া যে তিনি নিরবলম্ব অর্থাৎ জগতের সহিত সম্বন্ধবিহীন হইয়া আছেন, তাহা তাঁহারা বলেন না। স্পেন্সরের দুইটী উক্তিরই অযৌক্তিকতা দেখিয়া লইলাম; এখন প্রজ্ঞাবাদ লইয়া কিছু আলোচনা করিব।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ প্রবন্ধে ব্রহ্মতত্ত্বে কারণবাদ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়—ব্রহ্মতত্ত্বে প্রজ্ঞাবাদ।

আমরা দেখিয়া আসিলাম যে কারণবাদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব-পক্ষে অতি গুরুতর সাক্ষ্য প্রদান করে।

প্রজ্ঞাবাদ।

এইবারে দেখিব যে প্রজ্ঞাবাদও (Argument from Design) আর একদিক দিয়া তাঁহার অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে। আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে আমরা জগতে মানববুদ্ধির অতীত কৌশলপরম্পরাকে কার্য্য করিতে দেখিয়া আত্মপ্রত্যয়ের বলেই ঈশ্বরকে এই বিশ্বরচনার শিল্পী ও রচয়িতা বলিয়া উপলব্ধি করি। উদ্দেশ্য এবং তৎসাধনোপায় কৌশল স্থির করা আমাদের জ্ঞানের একটী অঙ্গ এবং এই অঙ্গটী থাকাতে আমরা সর্ব্বদাই জ্ঞানের পরিচায়ক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেছি। আমরা উপযুক্ত উপায় বাছিয়া লইয়া আমাদের মানসিক ভাব সকলকে কার্য্যে পরিণত করি। এখানে দেখি যে আমাদের কৃত কার্য্যের আমরাই প্রকৃত কারণ এবং আমাদের জ্ঞান আমাদের ইচ্ছার বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। আমাদের জ্ঞান না থাকিলে আমরা অভিলষিত কার্য্য করিবার ইচ্ছাও করিতাম না এবং যদি বা ইচ্ছা করিতাম, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতাম না। যে কার্য্য করিতে গেলে জ্ঞানপ্রয়োগ প্রয়োজন, অন্য কোথাও সেই কার্য্যের অনুরূপ কোন কার্য্য ঘটিতে দেখিলেই আমরা স্থির করিয়া লই যে তাহা আমাদিগেরই ন্যায় কোন সজ্ঞান মনুষ্য কর্ত্তৃকই সংঘটিত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ, তর্কের দ্বারা উপনীত নহে। পরিমাণে অল্পই হউক বা অধিক হউক, আমরা কোন কার্য্যের মধ্যে শৃঙ্খলা, কৌশল বা উপযোগিতা দেখিলেই তাহাতে জ্ঞানের

পরিচয় না দেখিয়া থাকিতে পারি না—ইহা আমাদের চিন্তার একটী নিয়ম। একটী প্রাসাদ দেখিলেও তাহাতে জ্ঞানের পরিচয় পাইব এবং একটী কুটীর দেখিলেও তাহাতে জ্ঞানের পরিচয় পাইব; এই দুই জ্ঞানের বস্তুগত সাদৃশ্য আছে, প্রভেদ কেবল মাত্রাগত। আমাদের আত্মপ্রত্যয় বলিয়া দিতেছে যে জ্ঞান বা বুদ্ধি আমাদের অন্তরে আছে এবং আমাদের কৃত শৃঙ্খলাবদ্ধ, কৌশলপূর্ণ কার্য্যের কারণ একমাত্র আমাদের এই জ্ঞান এবং এই কারণে শৃঙ্খলাবদ্ধ, কৌশলপূর্ণ কার্য্য দেখিলেই আমরা জ্ঞান বা বুদ্ধিকে তাহার কারণ বলিয়া স্থির করি।

প্রকৃতিতে প্রজ্ঞা-পরিচয়।

কৌশল, শৃঙ্খলা, উপযোগিতা প্রভৃতির কারণ একমাত্র জ্ঞান বা বুদ্ধি, এই সত্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া প্রকৃতির দিকে চাহিয়া দেখা যাউক যে প্রকৃতিতে কৌশল প্রভৃতির এবং সুতরাং জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় কি না। প্রকৃতি যে কৌশলের, শৃঙ্খলার, উপযোগিতার দৃষ্টান্তরাশিতে পরিপূর্ণ তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। বায়ু, সমুদ্র, পৃথিবী এইরূপ দৃষ্টান্তে ডুবিয়া আছে। তাহারা আমাদের প্রশংসা বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা বিশৃঙ্খল ব্যাপার নহে, প্রত্যুত ইহা সুশৃঙ্খলাবদ্ধ 'শোভন সুন্দর'। এই ব্রহ্মাণ্ড যে এক জ্ঞানময় পুরুষের হস্তরচিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না—ইহা আমাদের আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্য বিশ্বাস। এই বিশ্বাস মানবের এতদূর স্বভাবসিদ্ধ বা আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ যে বর্ত্তমান যুগে নাস্তিক্যবাদের প্রধান প্রচারক ডেভিড্ হিউমকেও এই কথা স্বীকার

ডেভিড হিউমের সাক্ষ্য।

করিতে হইয়াছে। একদিন মধুর সন্ধ্যাবেলায় তিনি একটী বন্ধুর সহিত বাটী আসিবার কালে তাঁহাকে বলিলেন যে "কেহই

আকাশের দিকে চাহিলে অনুভব না করিয়া থাকিতে পারে না যে ইহা কোনো জ্ঞানময় পুরুষ কর্তৃক সজ্জিত হইয়াছে"। যে জ্ঞানএই সমগ্র প্রকৃতিকে শোভনসাজে সজ্জিত করিয়াছে, সেই জ্ঞান কি আমাদের ন্যায় পরিমিত জ্ঞান? না, তাহা পরিপূর্ণ জ্ঞানস্বরূপের অনন্ত জ্ঞান।

তত্ত্বনিয়োজক কে?

স্থূলদর্শী বৈজ্ঞানিকগণ এই একটী নিতান্ত অযৌক্তিক আপত্তি উত্থাপন করেন যে, মনুষ্য হস্তের দ্বারা যন্ত্রাদি সংগঠন করে কিন্তু প্রকৃতির কার্য্য সকল সহস্র কৌশলময় হইলেও কাহারও হস্তের দ্বারা সংগঠিত হইতে দেখি না, আপনাপনি সংগঠিত হইতে দেখি, সুতরাং প্রকৃতির কার্য্যে জ্ঞানের পরিচয় স্বীকার করি কিরূপে? তাঁহারা আত্মপ্রত্যয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া কৌশলপূর্ণ প্রাকৃতিক কার্য্য সম্বন্ধে জ্ঞানের কারণত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহা-দিগের কেহ কেহ বলেন যে একটা প্রাকৃতিক তত্ত্ব হইতে এই সমুদয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। তত্ত্বকে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার কর্ত্তা আত্মা ব্যতীত তত্ত্ব যে কিরূপে কার্য্য করিতে পারে, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। আমার একটা জলস্রোতকে উচ্চে উঠাইবার প্রয়োজন আছে। জলের এই একটী তত্ত্ব আছে যে চাপ দিলেই জল উর্দ্ধদিকে উঠিয়া থাকে। কিন্তু আমি যদি কোন চাপ প্রয়োগ না করি, তাহা হইলে তত্ত্ব কি আপনাপনি কার্য্য করিতে পারে? না, তাহাকে নিযুক্ত করিবার কর্ত্তা চাই।

অভিব্যক্তি বস্তু কি?

পূর্ব্বোক্ত মতের ন্যায় অপরাপর বৈজ্ঞানিক অপরাপর মত প্রচার করেন; কিন্তু সেইগুলি এত সুস্পষ্ট ভ্রমাত্মক যে তাহা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই—দেখিলেই বুঝা যাইবে। এইবারে আমরা একটী

মত আলোচনা করিয়া দেখিব, যাহা বর্ত্তমানকালে অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক একবাক্যে সত্য বলিয়া স্বীকার করেন এবং যাহা, অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে, ঈশ্বরের জ্ঞানস্বরূপের অপেক্ষা না রাখিয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া এই বিশ্বচরাচরের উৎপত্তির কারণরূপে পরিগণিত হইতেছে—এই মতটীর নাম অভিব্যক্তিবাদ (Theory of Evolution)। এই মতটী যে সর্ব্বাঙ্গীন সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাহা নহে; তবে ইহা যে অনেক অংশে সত্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর ইহা সর্ব্বাঙ্গীন সত্য হইলেও যে জ্ঞানময় ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে, সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা বা ভ্রান্ত। যে সকল বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদের দ্বারা ঈশ্বরকে নিরাস করিতে যান, তাঁহাদের যুক্তি নিতান্ত অযৌক্তিক বাগাড়ম্বরমাত্র।

ঘোর অভিব্যক্তিবাদীগের মতে অভিব্যক্তির দুইটী সীমা সৃষ্টিবাষ্প ও মনুষ্য। সৃষ্টিবাষ্প হইতে অভিব্যক্তির আরম্ভ এবং মনুষ্যে অভিব্যক্তির শেষ। আমরা মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া আরোহণ প্রণালীক্রমে দেখিতে চেষ্টা করিব যে অভিব্যক্তিবাদটী কি। ডার্বিনপ্রমুখ অভিব্যক্তিবাদীগণ বলেন যে এই উন্নত জীব মনুষ্যের উৎপত্তির মূল অতি নিম্নপদবীস্থ কোন জীব। শেষোক্ত জীবসম্প্রদায়, যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন ও যৌন নির্ব্বাচন (Natural selection and sexual selection) এই দুই প্রণালীকে অবলম্বন করিয়া উন্নত জীবের জন্ম প্রদান করে, আবার তাহারা উন্নততর জীবের জন্ম প্রদান করে; এইরূপে কালক্রমে উন্নত হইতে উন্নততর জীব জন্ম গ্রহণ করিতে করিতে ক্রমে মনুষ্যের জন্ম হইয়াছে। অভিব্যক্তিবাদীগণ বিসৃষ্টিবাদকে অর্থাৎ ঈশ্বর যে প্রত্যেক বস্তু পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সৃষ্টি করিয়া-

ছেন এই মতকে অবৈজ্ঞানিক বলিয়া উপহাস করেন। তাঁহারা বলেন যে বিসৃষ্টিবাদই যদি সত্য হয়, তবে অনেক প্রাণীর অপ্রয়োজনীয় এবং অস্ফুট অঙ্গ সকল দেখিতে পাওয়া যায় কেন? মনুষ্যের আজি পর্য্যন্ত লাঙ্গুল অত্যন্ত অস্ফুট আকারে বর্ত্তমান রহিয়াছে দেখা যায়। আজি পর্য্যন্ত মনুষ্যের স্তনচিহ্ন দেখা যাইতেছে। তাঁহারা বলেন যে একমাত্র অভিব্যক্তিবাদই এই সকল সমস্যা মীমাংসা করিতে পারে। অভিব্যক্তিবাদ বলে যে পূর্ব্বে সেই সকলের প্রয়োজন ছিল কিন্তু ক্রমে প্রয়োজন চলিয়া যাওয়াতে সেই সকল অঙ্গের অব্যবহার হওয়ায় ক্রমে তাহারা অস্ফুট আকার ধারণ করিল।

মনুষ্যের অভিব্যক্তি বিষয়ে ডার্ব্বিন ও ওয়ালেস।

ডার্ব্বিন তাঁহার গ্রন্থে (Origin of Species) স্পষ্টই বলিয়াছেন যে যদি এমন একটী পদার্থেরও দৃষ্টান্ত দেখা যায়, যাহা যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের প্রণালীতে উৎপন্ন হইয়া তৎসংযুক্ত প্রাণীর অপ্রয়োজনীয় বা হানিকর হইয়াছে, তবে সেই একটী দৃষ্টান্তও অভিব্যক্তিবাদের বিপক্ষে অতি গুরুতর সাক্ষ্য প্রদান করিবে। সুপ্রসিদ্ধ অভিব্যক্তিবাদী ওয়ালেস, ডার্ব্বিনের এই মত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে অভিব্যক্তিবাদ মনুষ্যের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে না। কারণ, আদিম মনুষ্যদিগের মস্তক পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে অনেক মস্তকের মস্তিষ্ক অতি সুসভ্য মনুষ্যদিগের মস্তকস্থ মস্তিষ্কের সহিত পরিমাণে ও গঠনে সমান। মস্তিষ্ক ও তাহার গঠনাবর্ত্তন বুদ্ধির ও জ্ঞানের পরিমাপক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে সভ্য মনুষ্যদিগের সমান জ্ঞান অসভ্য মনুষ্যদিগেরও অন্তরে নিহিত আছে, তাহা বিকসিত

হউক বা মুদ্রিত থাকুক। কিন্তু অসভ্য আদিম মনুষ্যদিগের এতটা জ্ঞান আবশ্যক নাই—সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে কোন জ্ঞানময় পুরুষ পূর্ব্ব হইতেই প্রয়োজন জানিয়া তাঁহাদের অন্তরে তাহা নিহিত রাখিয়াছেন। আর প্রকৃতই আদিম মনুষ্যদিগের হৃদয়ে জ্ঞানবীজ সকল মুদ্রিত রহিয়াছে বলিয়াই তাহারা জ্ঞানের কথা সকল ধারণ করিতে পারে এবং ক্রমে সভ্য অবস্থায় উপনীত হইতে পারে।

পশুদের অভিব্যক্তি।

যাই হউক, এই অভিব্যক্তিবাদ মনুষ্যের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে না খাটিলেও আমরা বিচারস্থলে স্বীকার করিয়া লইতেছি যে মনুষ্য পশু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার পরে অভিব্যক্তিবাদ আর একটু অগ্রসর হইয়া বলে যে পশুরাজ্যও ক্রমে উদ্ভিদরাজ্য হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। অভিব্যক্তিবাদীগণ তাঁহাদের প্রকটিত প্রণালী সকলের মূলে এই স্বীকার্য্য ধরিয়া লয়েন যে প্রতি জীবের আপনা হইতে কিঞ্চিৎ বিভিন্ন জীব প্রসব করিবার এক দৃঢ়নিহিত ভাব আছে। কিন্তু অধ্যাত্মবাদীগণ জিজ্ঞাসা করেন যে এই ভাব দেন কে? এই ভাবের বলে উদ্ভিদ হইতে ক্রমে জীবজন্তুর উৎপত্তি হইয়াছে, ইহাই অভিব্যক্তিবাদের মত। যাহাই হউক, বৈজ্ঞানিকগণ সম্পূর্ণরূপে প্রমাণ করিতে না পারিলেও আমরা ইহাও স্বীকার করিলাম যে উদ্ভিদ হইতে জীবজন্তু অভিব্যক্ত হইয়াছে।

প্রাণের অভিব্যক্তি।

এইবারে আমরা প্রাণের অভিব্যক্তি সম্বন্ধে অভিব্যক্তিবাদীগণ কি বলেন দেখিব। অভিব্যক্তিবাদীদিগের কেহ কেহ বলিতে চাহেন যে জড়পদার্থ হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইয়াছে। হেকেল ও ব্যাষ্টিয়ান প্রভৃতির এই মত। কিন্তু হক্‌সলি প্রভৃতি অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক

এই মত সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিয়াছেন।* টিণ্ডাল, পাস্তর (Pasteur) প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া অনেক পরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে জড়পদার্থ হইতে প্রাণের অভিব্যক্তি অসম্ভব। পাস্তর (সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি বৈজ্ঞানিক) ব্যাষ্টিয়ান্‌কে পরীক্ষার দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন কিন্তু ব্যাষ্টিয়ান্ তাহাতে এক প্রকার পশ্চাৎপদ হইয়া গেলেন। সার্ উইলিয়ম টমসন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতি সম্বন্ধীয় পুস্তকে যদিও অনুমান করিয়াছেন যে ভৌতিক তত্ত্বাবলীর সাহায্যে প্রাণপদার্থ কি জানিলেও জানা যাইতে পারে কিন্তু প্রাণ বিনা প্রাণের উৎপত্তি যে অসম্ভব তাহা তিনি স্বীকার করিতে †বাধ্য হইয়াছেন।

এখন দেখিতেছি যে প্রাণ বিনা প্রাণের উৎপত্তি অসম্ভব এবং ইহাও দেখিতেছি যে এই জগতে প্রাণরাশি বিচরণ করিতেছে। এই সকল দেখিয়া কে অস্বীকার করিতে পারে যে এই প্রাণরাশি প্রাণদাতা মহাপ্রাণ হইতে আসে নাই? এই প্রাণময় জগত উচ্চৈঃস্বরে সেই মহাপ্রাণের অস্তিত্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতেছে।

ভাল, যদি এমন হয় যে বিজ্ঞান একদিন প্রমাণ করিতে পারিবে যে জড় পদার্থ হইতে প্রাণের অভিব্যক্তি হয়, আমরা এই বিচার স্থলে তাহাও স্বীকার করিয়া লইলাম। এই বারে

---

* Calderwood's "Science and Religion.

† "But let no one imagine that, should we ever penetrate this mystery, we shall thereby be enabled to produce, except from life, even the lowest form of life. Recent Advances in in Physical Science, p. 24.

দেখা যাউক যে বিজ্ঞান এই জড়পদার্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে কি বলে।

জড়ের উৎপত্তি।

জড়পদার্থ হইতে যে প্রথম প্রাণ জীবাদির উৎপত্তি হইতে পারে আমরা তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছি। জীবাদি-প্রাণ পঙ্কের ন্যায় সমুদ্র-তলে বর্ত্তমান, এই কারণে বৈজ্ঞানিকগণ তাহার নাম দিয়াছেন প্রাণপঙ্ক (Protoplasm)। জীবাদির এই কর্দ্দমভাব অধিক পরিমাণে জলগ্রহণ করিবার ফল। এখন এই জল উৎপন্ন হইল কিরূপে, ইহাই প্রশ্ন। এই প্রশ্ন সম্পর্কে বিজ্ঞানের নানা জটিল প্রশ্ন উত্থিত হইবার সম্ভাবনা। আমরা সেই সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল যেগুলি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকল্প, সেই গুলিরই সাধ্যমত অনুসরণ করিব। বিজ্ঞান যাঁহারা কিছুমাত্র পড়িয়াছেন, তাঁহারা ইহা বেশ জানেন যে এই পৃথিবী একসময়ে অতি উষ্ণ ছিল; সমস্ত জল ও সমস্ত পদার্থ একমাত্র বাষ্পাকারে আকাশে বিরাজ করিতেছিল। পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে যাঁহারা কোন প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন; তাঁহারাই এই সৃষ্টিবাষ্পকে স্বীকার করিয়াছেন; ক্যাণ্ট, লাপ্লাস, হর্সেল প্রভৃতি প্রায় সকলেই এই মত সমর্থন করিয়াছেন; তন্মধ্যে সার উইলিয়ম টমসন প্রস্তরাদি কতকগুলি অতিরিক্ত পদার্থও স্বীকার করিয়াছেন। অভিব্যক্তিবাদীগণ লাপ্লাস কর্ত্তৃক সংশোধিত ক্যাণ্টের মতই গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং তাহাই সাধারণ-প্রচলিত, সুতরাং আমরা সেই মতেরই আলোচনা করিয়া ক্ষান্ত থাকিব। সেই মতটী এই যে প্রথমে একমাত্র সূর্য্য তাহার উত্তপ্ত বায়ু দ্বারা সমস্ত আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এই সূর্য্য ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমে শীতল হইতে লাগিল; এবং সেই সময়ে কোন

প্রাকৃতিক নিয়মে সূর্য্যের বহির্ভাগে অবস্থিত অংশগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া গ্রহাদির জন্মদান করিয়াছে। হার্ব্বার্ট স্পেন্সারও এই মতে সায় দিয়াছেন।

তবেই দেখিতেছি যে অভিব্যক্তিবাদীগণ সৃষ্টির প্রারম্ভে কেবল সৃষ্টিবাষ্প লইয়াই ক্ষান্ত নহেন, তৎসঙ্গে একটী সূর্য্যেরও অস্তিত্ব কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এখন, এই সূর্য্যকে কে প্রথম স্থাপিত করিয়াছিলেন? আর যদি ইহাও স্বীকার করিয়া লই যে সূর্য্যও ছিল না, কেবল একমাত্র সৃষ্টিবাষ্পই ছিল, তাহা হইলে আমাদিগকে ইহা স্বীকার করিতেই হয় যে এই সৃষ্টিবাষ্পের মধ্যেই এই শোভন সুন্দর জগতের উৎপত্তির সম্ভাবনা*ছিল। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, সৃষ্টিবাষ্প হইতে জগতের উৎপত্তি কাহারও জ্ঞানে বর্ত্তমান ছিল— এই মহান্ জ্ঞান আমরা সেই অনন্তজ্ঞান পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কুত্রাপি দেখিবার আশা করি না। আমরা কারণবাদ আলোচনা কালে দেখাইয়াছি যে, সৃষ্টিবাষ্প ইচ্ছাময় পুরুষের ইচ্ছার পক্ষে কেমন গুরুতর সাক্ষ্য প্রদান করে; আবার এখন দেখিতেছি যে সৃষ্টিবাষ্প জড়পদার্থ হইয়াও জ্ঞানময় পুরুষের জ্ঞানের পক্ষে কি সুন্দর সাক্ষ্য দিতেছে।

জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে বিজ্ঞান নীরব।

আমরা এতক্ষণ দেখিয়া আসিলাম যে অভিব্যক্তিবাদ অবলম্বন করিয়া অভিব্যক্তিবাদীগণ কেবল জড়-পদার্থেরই উন্নতি প্রকাশ করিতে পারেন। আমরা সমস্তই স্বীকার করিয়া লইয়াছি—

*"It will be better to descend to the more limited form of the nebular hypothesis which was enunciated by Laplace, and which assumes for the starting point a sun, the nucleus of which is already globular in shape." (First Principles, ch. XIX.)

সৃষ্টিবাষ্প হইতে জড়জগতের অভিব্যক্তি, জড়পদার্থ হইতে জীবাদির অভিব্যক্তি, জীবাদি হইতে জীবজন্তুর অভিব্যক্তি এবং সর্ব্বশেষে জীবজন্তু হইতে মনুষ্যের অভিব্যক্তি; বিজ্ঞান যদিও সমস্ত বিষয়টী অভ্রান্তরূপে প্রমাণ করিতে পারে নাই, কিন্তু আমরা স্বীকার করিয়া লইয়াছি যে এক কালে বিজ্ঞান এই সকল সপ্রমাণ করিলেও করিতে পারে। বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদ এই সকল সপ্রমাণ করিলেও আমাদের জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে একটী কথাও বলিতে পারে না। ইহা বড় আশ্চর্য্য অভিব্যক্তিবাদীগণ বলেন যে, অভিব্যক্তিবাদ অবলম্বন করিলেই জগতের সৃষ্টি বিষয়ক সকল সমস্যাই মীমাংসিত হইবে অথচ সৃষ্টির একটী প্রধান অঙ্গ জ্ঞানের বিষয় কোন কথা বলিতে চাহেন না; প্রত্যুত জ্ঞানকে তাঁহারা একটী দুরূহ সমস্যা বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা যে ভাবের কথা বলেন, তাহাতে বোধ হয় যেন এই জড়জগতে অভিব্যক্তি শক্তি নীরব ভাবে কার্য্য করিয়া চলিতেছে. অথচ জগতের আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল সন্দর্শন করিয়া কেহই আশ্চর্য্য হইতেছে না; সর্ব্বত্র প্রাণীগণ প্রাণন কার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেছে, কিন্তু তাহারা তাহাদের সুখদুঃখ যেন অনুভব করিতেছে না; তাহাদের একটিরও যেন চিন্তাশক্তি নাই, কল্পনাশক্তি নাই,—সকলেই যেন এক মহা অজ্ঞানের মধ্যে বাস করিতেছে।

জড় হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি অসম্ভব।

আমাদের যে জ্ঞান আছে, ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু এই জ্ঞানের উৎপত্তি বিষয়ে বলিতে গিয়া চার্ব্বাক্ যেমন চূন ও হলুদের দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেইরূপ যদি কেহ বলেন যে মস্তিষ্কপরমাণুর ন্যায় জড়-পদার্থেরই সমষ্টি হইতে ইহার উৎপত্তি, তাহা তাঁহার অন্ধতা

ব্যতীত আর কিছুই নহে। জড়পদার্থের সমষ্টি হইতে এ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান একবিন্দুও জ্ঞান প্রস্তুত করিতে পারে নাই। কেবল তাহা নহে, জড়পদার্থের সহিত যে জ্ঞানের কি প্রকারে সংযোগ হইল, তাহাও বিজ্ঞানের অতীত এবং বিজ্ঞান এপর্য্যন্ত এই সমস্যা পূরণ করিতে পারে নাই, পারিবে বলিয়া আশাও নাই। এই তত্ত্বটী অজ্ঞেয়বাদীদিগের অন্যতম শিরোভূষণ টিণ্ডাল অতি স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।*

যে জ্ঞান গ্রহনক্ষত্রাদির গতি আবিষ্কার করিতে যায়, সে প্রকার জ্ঞানের কথা দূরে থাক্, একটী সামান্য অনুভূতিও জড়-পদার্থের সমষ্টি হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং দেখিতেছি যে জড়পদার্থ ও জ্ঞান এই দুইটী পৃথক্ পদার্থ; এই জ্ঞান

---

*"The passage from the physics of the brain to the corresponding facts of conciousness is unthinkable. Granted that a definite thought and a definite molecular action occur in the brain simultaneously, we do not possess the intellectual organ nor apparently any rudiment of the organ, which world enable us to pass by a process of reasoning from the one phenomenon to the other. They appear together, but we do not know why. Were our minds and senses so expanded, strengthened, and illuminated, as to enable us to see and feel the very molecules of the brain, were we capable of following all their motions, all their groupings, all their electric discharges, if such their be ; and were we intimately acquainted with the corresponding states of thought and feeling,—we should be as far as ever from the solution of the problem—How are these physical processes connected with the facts of conciousness. The chasm between the two classes of phenomena would still remain intellectually impassable.

যদি সেই জ্ঞানস্বরূপ ভূমা পরমেশ্বর মানবাত্মায় না প্রেরণ করি-বেন, তবে আমরা পাইব কোথা হইতে ?

ঈশ্বর স্থষ্টিনিয়ন্তা।

আবার, কোন কোন অজ্ঞেয়বাদীর মতানুসরণ করিয়া যদি ইহাও স্বীকার করা যায় যে সৃষ্টিবাষ্পের মধ্যে জড়পদার্থের ন্যায় জীবজন্তু মনুষ্যগণ শক্তি-গতভাবে বিরাজ করিতেছিল, তাহা হইলেও আমরা তাহাতে জ্ঞানময় পুরুষের হস্ত ব্যতীত অন্য কিছুই দেখিতে পাই না; কারণ, এক সময়ে অখণ্ড নিয়মে আবদ্ধ ও গিরিনদী পর্ব্বত সমুদ্র দ্বারা পরিশোভিত এই সুন্দর জগত সেই অন্ধকারময় সৃষ্টিবাষ্পের মধ্য হইতে যে উত্থিত হইবে, এই মহান্ ইচ্ছা আর কোথা হইতেও আসিতে পারে না। সৃষ্টিবাষ্প এই জগত উৎপাদনের, শৃঙ্খলাবন্ধনের বীজ পাইল কোথা হইতে ? কে অভিব্যক্তি-নিয়মকে জগতরচনার পক্ষে নিযুক্ত করিল ? মূল কারণ দেখিতে গেলে আমরা এক ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। অভিব্যক্তি একটী কার্য্যপ্রণালীমাত্র—ইহা কেবল বলিয়া দেয় যে কি উপায়ে কার্য্য হইতেছে। কিন্তু যখনি একটী কার্য্য-প্রণালীর কথা ভাবি, তখনি মনে প্রশ্ন আসে যে কাহার জ্ঞান এই প্রণালীকে নিয়মিত করিতেছে। যে অভিব্যক্তিরূপ মহান্ নিয়ম জগতে কার্য্য করিতেছে, সেই অভিব্যক্তি সেই মহাজ্ঞানই প্রেরণ করিয়াছেন।

প্রজ্ঞাবাদ—সঙ্কীর্ণ ও প্রশস্ত।

এইরূপে আমরা যে দিক্ দিয়াই দেখি, জ্ঞানময় পরমেশ্বরের সত্তা স্বীকার না করিলে কৌশলময় জগতের অস্তিত্বসমস্যা কিছুতেই মীমাংসিত হয় না। কেহ যেন এরূপ না মনে করেন যে জ্ঞানস্বরূপের নিয়ন্তৃত্ব স্বীকার করিলে অবৈজ্ঞানিকের কার্য্য করা

হয়। অধ্যাপক হক্‌স্‌লি ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে সঙ্কীর্ণ প্রজ্ঞা-বাদ, যে মতে প্রতি বস্তু ঈশ্বর কর্তৃক পৃথক্ ভাবে সৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করে, তাহাই বিজ্ঞানের অসম্মত; কিন্তু প্রশস্ত প্রজ্ঞাবাদ, যে মতে ঈশ্বরকে জগতের মূল নিয়ন্তা বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা বিজ্ঞানের অসম্মত নহে। *

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত অধ্যাত্ম ধর্ম্ম
ও অজ্ঞেয়বাদ প্রবন্ধে ব্রহ্মতত্ত্বে প্রজ্ঞাবাদ
নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

---

* No doubt it is quite true, that the doctrine of evolution is the most formidable opponent of all the coarser forms of teleology. The teleology which inagines that the eye, such as we find it in man or one of the higher animals, was made, with the precise structure it exhibits, for the purpose of enabling the animal who possesses it to see, has undoubtedly received its deathblow. But it is necessary to remember that there is wider teleology, which is not touched by the doctrine of evolution, but actually based upon the fundamental proposition of evolution. The teleological and meehanical views of nature are not necessarily mutually exclusive. On the contrary, the more purely a mechanist the speculator is. the more firmly does he assume the primordial molecular arrangement, of which all the phenomena of the universe are the consequeuces ; and the more completely is he thereby at the mercy of the teleologist who can always defy him to prove, that this primordial molecular arrangement was not intended to evolve the phenomena of the universe.—The Academy Oct. 1869.

অষ্টম অধ্যায়—দ্যুলোকে ঈশ্বর।

উপনিষদ—মন্ত্র।

কাহার শাসনে এই সূর্য্য চন্দ্র, এই দ্যুলোক ভূলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে? কে এই আকাশের মধ্যে থাকিয়া অগণ্য সূর্য্য চন্দ্র, অগণ্য গ্রহনক্ষত্রকে পরিচালনা করিতেছেন? কাহার আদেশে ইহারা ভ্রাম্যমাণ হইতেছে? এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যা চন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ।
এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ॥

"এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি! সূর্য্য চন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে। এই অক্ষর পুরুষের শাসনে, হে গার্গি! দ্যুলোক ও ভূলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে।" এই সকলই সেই মহান্ পুরুষ পরমেশ্বরেরই ইচ্ছাতে পরিচালিত হইতেছে; তাঁহারই শক্তি দ্বারা শক্তিবিশিষ্ট হইয়া, এই সকলই ভ্রাম্যমাণ হইতেছে।

পৃথিবীর গতি

আমাদের এই পৃথ্বী-গোলক, স্বীয় উপগ্রহ চন্দ্রের সহিত মহাশূন্যের মধ্য দিয়া, প্রতি সেকেণ্ডে (অর্থাৎ 'এক' বলিতে যতটুকু সময় লাগে সেইটুকু সময়ের মধ্যে) গড়ে ১৮ মাইল ছুটিয়া থাকে। কি দারুণ বেগ! 'এক' এই কথাটি উচ্চারণ করিতে না করিতেই পৃথিবী ৯ ক্রোশ চলিয়া গিয়াছে! পৃথিবীকে এই রূপে ৫৮০,০০০,০০০ মাইল চলিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতে হয়। এই যে পৃথিবী এতটা পথ সবেগে পরিভ্রমণ করে, কিন্তু কখনো কি

কেহ ইহাকে অনিয়মিত হইতে দেখিয়াছে? সেই যে প্রথম বৎসর পৃথিবী সূর্য্যকে কিঞ্চিদধিক ৩৬৫ দিনে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিতেছিল, আজও কি ঠিক ততদিনেই প্রদক্ষিণ করিতেছে না? এই প্রদক্ষিণ-কার্য্য বিন্দুপরিমাণেও অনিয়মিত ভাবে হইতে পারে না। চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে; যেমন পৃথিবী সেই চন্দ্রের সহিত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, সেইরূপ আবার আমাদের এই সূর্য্য, স্বকীয় গ্রহগণের সহিত অপর এক বৃহত্তর সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। এইরূপ সূর্য্যের পর সূর্য্য চলিয়াছে। সুতরাং আমাদের এই পৃথিবী একবার যে পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, দ্বিতীয়বার সেই পথ দিয়া যাইতে পারিবে না। তবে একবার ভাবিয়া দেখ যে, এই পৃথিবীর কক্ষপথের অন্ত কোথায়!

ঈশ্বরের পরিচয়

আবার কেবল এই একমাত্র পৃথিবীই যে দারুণ দ্রুতগতিতে শূন্যপথে ভ্রমণ করিতেছে, তাহা নহে। কত গ্রহ নক্ষত্র পৃথিবী অপেক্ষা অধিকতর বেগে চলিতেছে। ইহারি মধ্যে আবার কত ধূমকেতু চলিয়া যাইতেছে; কত নূতন পৃথিবী সৃষ্ট হইতেছে—কিন্তু ইহার মধ্যে তো কিছুমাত্র অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা দেখা যায় না। সমস্তই শৃঙ্খলার দ্বারা, নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতেছে। তখন কেমন করিয়া বলিব যে, এই সকল কার্য্য সেই মহাশক্তি, মঙ্গল স্বরূপ পূর্ণ পুরুষের হস্ত প্রদর্শন করিতেছে না!

জড়াতীত শক্তি

কেহ কেহ বলেন যে, প্রত্যেক পরমাণুতে গতিশক্তি আছে; সেই গতিশক্তির বলেই, কেবল এই গ্রহাদির পরিভ্রমণ নহে, জড়জগতের সকল কার্য্যই চলিতেছে। স্বীকার করিলাম যে, পরমাণুর গতিশক্তির বলেই

জড়জগতের সকল কার্য্যই চলিতেছে। তাড়িত শক্তিই বল, চৌম্বক শক্তিই বল, সকলই যে একমাত্র শক্তির বিভিন্ন প্রকার পরিবর্ত্তন মাত্র, তাহা বর্ত্তমানে বিজ্ঞানের দ্বারা স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কথা হইতেছে এই যে পরমাণুগণ সেই গতিশক্তি পাইল কোথা হইতে? সকলপ্রকার শক্তি যে একই শক্তির বিভিন্ন আকার মাত্র, ইহা যেমন একটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত, সেইরূপ বিজ্ঞানের ইহাও আর একটি সিদ্ধান্ত যে, পরমাণুগণের গতি থাকিলে, তাহারা আপনা-আপনি থামিতে পারে না, এবং তাহাদের গতি না থাকিলে আপনা-আপনি চলিতে পারে না; কারণ, পরমাণুগণ জড়বস্তু—সচেতন পদার্থ নহে। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, পরমাণুগণ প্রথম গতিশক্তি পাইল কোথা হইতে? পৃথিবীই বল, সূর্য্যই বল, ইহারা প্রথম চলিতে আরম্ভ করিল কি প্রকারে? ইহারা জড়বস্তু; সুতরাং শক্তি প্রাপ্ত না হইলে আপনা-আপনি শক্তিবিশিষ্ট হইতে পারে না। অতএব, জড়-বস্তু মাত্রে জড়বস্তু হইতে অতিরিক্ত শক্তি নিয়োগ করা চাই-ই।

শক্তিদাতা ঈশ্বর

এই শক্তি তবে কে দিয়াছেন? যে শক্তিবলে অগণ্য সূর্য্য চন্দ্র, অগণ্য গ্রহ-নক্ষত্র ভ্রাম্যমাণ হইতেছে, সেই শক্তি প্রদান করিবার ক্ষমতা, কোন্ পরিমিত-শক্তিবিশিষ্ট জীবের থাকিতে পারে? সেই শক্তি দিতে পারেন—কেবল সেই এক ইচ্ছাময় পূর্ণ পুরুষ। এই শক্তি তিনি যে কেমন করিয়া দিলেন, তাহা অবশ্য আমরা জানিতে পারি না, এবং তাহা মানবের বুদ্ধির অতীত। কিন্তু তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে যে জড়বস্তুগণ স্বীয় স্বীয় শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাতেই বলিলাম যে, জড়বস্তু সকলে "অতি-রিক্ত শক্তির নিয়োগ করা হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন যে, পরমাণু বলিয়া কোন পদার্থ নাই; কেবল শক্তির কতকটা সমষ্টি মাত্র আছে।

মূল কারণ ঈশ্বর

শক্তি, পরমাণু ভিন্ন পৃথক্ থাকিতে পারে কি না, এবং পরমাণু শক্তি ভিন্ন পৃথক্ থাকিতে পারে কি না, অথবা কেবল শক্তিসমষ্টি আছে, কিম্বা পরমাণু ও শক্তি উভয়ই আছে, এই সকল অতি দুরূহ সমস্যা হইলেও আমরা ইহা বলিতে পারি যে, ব্যবহারিক পরমাণু ও ব্যবহারিক শক্তি, এই দুই বস্তু, অন্ততঃ আমাদের ব্যবহারিক চক্ষে, নিতান্তই বিভিন্ন পদার্থ। এই দুই ব্যবহারিক পদার্থের ব্যবহারিক সংযোগই বা কে করাইয়া দিলেন? আর যদি বা কেবলমাত্র শক্তিসমষ্টিরই অস্তিত্ব থাকে, তবে সেই শক্তিসমষ্টিই বা আসিল কোথা হইতে? এই কারণ অন্বেষণ করিতে আমরা যতদূর যাই না কেন, যতক্ষণ না মূল কারণ ঈশ্বরে যাইয়া পড়ি ততক্ষণ কিছুতেই আমরা প্রকৃত কারণে উপনীত হইতে পারি না।

একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের কথা উদ্ধৃত করিতেছি:—

'বৈজ্ঞানিক যদি কার্য্যকারণতত্ত্ব স্বীকার করেন, তবে তাঁহাকে স্বতন্ত্র কোনো অনন্ত অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; যদি তিনি শক্তির পুঞ্জীকরণ স্বীকার করেন, তবে তিনি এক অনন্ত শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারেন না; যদি তিনি চেত-*

* "The student of Nature who starts from the axiom of the universality of the law of causation, cannot refuse to admit an eternal existence; if he admits the conservation of energy, he can not deny the existence of an eternal energy; if he admits the existence of immaterial phenomena in the form of consciousness, must admit the possibility, at any, rte, of an eternal series of such phenomena. Prof. Huxley.

নার অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তবে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হয় যে, চেতনার এক অনন্ত শ্রেণী চলিয়াছে।" আমরা ইহার উপর তাঁহাকে ইহাও বলিতে বলি যে যদি বৈজ্ঞানিক প্রেমের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তবে তাঁহাকে এক অনন্তপ্রেমের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; যদি তিনি জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তবে তাঁহাকে এক অনন্ত জ্ঞানের অস্তিত্বও স্বীকার করিতেই হইবে। এই সঙ্গে তাঁহাকে ইহাও জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, জ্ঞান, প্রেম, চেতনা প্রভৃতি কি শূন্যে শূন্যে থাকিতে পারে? অথবা তাহারা কাহাকেও আশ্রয় করিয়া থাকিবে? অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত শক্তি,—এক সেই ঈশ্বর ভিন্ন আর কে এই সকলের আশ্রয় হইবেন?

কেপ্লারের সাক্ষ্য

আর এক কথা এই যে, যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতে আমাদের গুরুতর পরিশ্রম আবশ্যক, প্রগাঢ় বিদ্যাবুদ্ধি আবশ্যক, সেই সকল বিষয় দৈবক্রমে পরমাণুর গতিক্রম বশতঃ সংঘটিত হইয়াছে, ইহা সম্ভবপর? না এক ইচ্ছাময় পূর্ণজ্ঞান পরম পুরুষের ইচ্ছানুসারে হইয়াছে, ইহাই সম্ভবপর? কোনো সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মান পণ্ডিত (Kepler) গ্রহগণের গতির নিয়ম আবিষ্কার করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন,—

"O God! I think Thy thoughts after Thee"

হে পরমেশ্বর! আমি তোমারই চিন্তার অনুসরণ করিতেছি। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এইসকল গতির নিয়ম গ্রহগণের ঘুরিবার এক প্রণালী মাত্র; কিন্তু পশ্চাতে যদি সেই শক্তিদাতা পুরুষ না থাকিতেন, তবে কিছুতেই গ্রহগণ গণিতের সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত সকল অনুসরণ করিয়া পরিভ্রমণ করিতে পারিত না। 'দৈবক্রমে' কথাটি উঠিয়াছে—জগতের এমন কোনো বস্তু কি আছে, এমন

কোনো ঘটনা কি আছে—যাহা দৈবাৎ হইতে পারে, যাহা কোনো কারণবশতঃ হয় নাই? এমন কোনো কিছু নাই। যাঁহারা এই জগৎসৃষ্টিকে দৈবক্রমে সংঘটিত হইয়াছে বলেন, তাঁহাদের কথা একেবারেই গ্রাহ্য নহে। ইহা জ্ঞান বিজ্ঞানের মূল সমূলে ধ্বংশ করিবে। যদি এই জগৎসৃষ্টি প্রকৃতই দৈবক্রমে সংরচিত হইত, তাহা হইলে ভাস্করাচার্য্যই বা জন্মগ্রহণ করিলেন কেন, আর গ্যালিলিও প্রভৃতি স্বীয় প্রাণদানেও উদ্যত হইলেন কেন? তাহা হইলে তাঁহারা গ্রহগণের গতির নিয়মাদি আবিষ্কার করিতে পারিতেন না; কারণ, যাহা দৈবক্রমে হইয়াছে এবং দৈবক্রমে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, তাহার আবার নিয়ম কিসের? আমরা যত কারণ দেখিতে পাই, সেগুলি আনুষঙ্গিক কারণমাত্র (Secondary cause) কিন্তু মূল কারণ (Primary cause) অন্বেষণ করিলেই দেখিতে পাই যে, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া অপর মূল কারণ নাই।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিরচিত অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ প্রবন্ধে দ্যুলোকে ঈশ্বর নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

নবম অধ্যায়—ভূলোকে ঈশ্বর।

অপর বৈজ্ঞানিক আপত্তি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বর্ত্তমানকালে কেহ কেহ বিজ্ঞানের অন্যতর সিদ্ধান্ত অভিব্যক্তিবাদকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান মনে করেন। আমরা অন্যান্য অধ্যায়ে সাধারণতঃ সৃষ্টির অভিব্যক্তি বিষয়ে বলিয়া আসিয়াছি। বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা ভূলোকে প্রাণীদিগের অভিব্যক্তি বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া লইব।

প্রাকৃতিক কার্য্যে জ্ঞানের পরিচয় পাই কি না।

অধিকাংশ অভিব্যক্তিবাদীগণের মতে, যদি প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই একজাতীয় প্রাণী হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর উৎপত্তি হইল, তখন ঈশ্বর স্বীকারের কোনও প্রয়োজনই দেখা যায় না। স্বীকার করিলাম যে, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই এক প্রাণী হইতে বংশানুক্রমে অবস্থার উপযোগী হইয়া বিভিন্ন প্রাণীসমূহ উৎপন্ন হইতেছে, এবং রক্ষা পাইতেছে। প্রথমেই এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে, প্রাণ আসিল কি প্রকারে? বৈজ্ঞানিকেরা এ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত পারেন নাই, এবং আমরাও এ বিষয়ে এখন কোন বিচার করিব না। ধরিয়া লইলাম যে, প্রথম প্রাণ যে কোন প্রকারেই হউক, আসিয়াছে। আমাদের দ্রষ্টব্য এই যে, এই প্রাণ হইতে যে ক্রমে ক্রমে উন্নত জীবজন্তু হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহাতে কোন্ জ্ঞানের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় কি না? আমরা যদি প্রাকৃতিক কার্য্যের মধ্যে কোনো জ্ঞানের কার্য্য দেখিতে পাই তবেই বুঝিতে পারিব যে এই সকল ঘটনা কোনো সজ্ঞান

পুরুষ কর্তৃক নিয়মিত হইতেছে। কারণ জ্ঞান থাকিলেই ইচ্ছা থাকিবে এবং জ্ঞান ও ইচ্ছা কখনই শূন্যে শূন্যে থাকিতে পারে না।

দৃষ্টান্ত স্বরূপে প্রজাপতির বিষয় আলোচনা করা যাউক। কয়েক জাতীয় প্রজাপতি আছে, তাহাদিগকে নানা কারণে পক্ষীরা আহার করে না। তাহারা বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়া আকাশে নির্ভয়ে বিচরণ করে; পক্ষীরাও তাহাদিগের উজ্জ্বলবর্ণ দেখিয়া চিনিতে পারিয়া তাহাদিগকে ধরিতে যায় না। অপর কয়েক জাতীয় প্রজাপতি আছে, তাহারা পক্ষীদিগের উপাদেয় আহার। তাহারা যদি পূর্ব্বোক্ত প্রজাপতিদিগের অনুকরণ করে, তবেই তাহারা নিরাপদ হইতে পারে। অনুকরণ তাহাদিগের নিতান্ত আবশ্যক হইল। পরিবৃত্তির নিয়মানুসারে তাহাদিগের বংশপরম্পরায় অবস্থার উপযোগী অনুকরণ সংঘটিত হইতে লাগিল। বর্ত্তমান কালের শেষোক্ত প্রজাপতিদিগেকে দেখিলে, সহসা প্রথমোক্ত প্রজাপতিদিগের সহিত তাহাদিগের প্রভেদ বুঝা যায় না।

প্রজাপতির দৃষ্টান্ত।

অভিব্যক্তিবাদের মতে যে সকল প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে বিভিন্ন জীব উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে পরিবৃত্তি একটি প্রধান নিয়ম। প্রজাপতির দৃষ্টান্তেই দেখা যাউক্। ধরিয়া লইলাম যে, অনুকারক প্রজাপতিদিগের অনুকরণোপযোগী পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনের সূত্রপাত হইল। তাহাদিগের শাবকগণ যদি ঠিক পিতামাতার ন্যায় হয়, তাহা হইলে তাহারা বাঁচিতে পারে না। কিন্তু সেই শাবকগণের মধ্যে, প্রায়ই দেখা যায়, কোনটা বা পিতৃ-প্রজাপতির ন্যায় হইল! কোনটা বা পিতৃ-প্রজাপতির ন্যায় না হইয়া কতকপরিমাণে

পরিবৃত্তি-প্রণালী।

অনুকৃত প্রজাপতির ন্যায় হইয়া পড়িল। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, উক্ত শাবকগণের মধ্যে যাহারা পিতৃ-প্রজাপতির ন্যায়, তাহাদিগের অপেক্ষা অপর শাবকগণেরই পক্ষী প্রভৃতি শত্রুদিগের হাত এড়াইয়া বাঁচিয়া থাকিবার অধিক সম্ভাবনা আছে। এই প্রকার পিতৃ-প্রজাপতি হইতে পরিবর্ত্তন বংশপরম্পরায় হইতে হইতে কয়েক বংশ চলিয়া গেলে, সর্ব্বশেষবংশীয় প্রজাপতিগণ প্রথম পিতৃপুরুষ হইতে এতটা ভিন্নাকার ও ভিন্নপ্রকৃতি হইতে পারে যে, উভয় প্রজাপতিই যে একজাতীয়, তাহা বুঝিতে অনেক সময় ভ্রম হইতে পারে। এইরূপ জীবমাত্রেরই শাবকগণ যে পূর্ব্বপুরুষ হইতে প্রায় কিছু না কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তাহাকেই পরিবৃত্তির নিয়ম (Law of variation) বলা যায়।

পরিবৃত্তির উপায় বলিতে বিজ্ঞান অক্ষম।

এই পরিবৃত্তির নিয়মানুসারে, অনুকারক প্রজাপতিদিগের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল বটে। কেন হইল—তাহাদিগের আত্মরক্ষা ও বংশবৃদ্ধির জন্য। এইখানে এইটুকু বলিয়া রাখি যে, তাহারা আত্মরক্ষা করিবার জন্য যে আপনাদের ইচ্ছানুসারে পরিবর্ত্তিত হইল, তাহা নহে; তাহাদের পরিবর্ত্তন হইল বলিয়াই আত্মরক্ষা হইতে পারিল। কি উপায়ে এই পরিবর্ত্তন হইল?—ইহার উত্তর প্রদান করিতে বিজ্ঞান অসমর্থ। পিতৃ-প্রজাপতিগণ এই আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তনের বিষয় কিছুই জানে না; আর যদিই বা জানে, তবে তাহাদের কি ক্ষমতা যে, শাবকদিগের একটি রোমও রঞ্জিত করিতে পারে? মাতৃ-প্রজাপতির ক্ষমতা এই পর্য্যন্ত যে, সে তাহার আপনার রুচি অনুসারে পিতৃ-প্রজাপতি বাছিয়া লইতে পারে। কিন্তু ডিম্ব প্রস্তুত হওয়া প্রভৃতি বিষয় তাহার আয়ত্তাধীন নহে। তাহার শাবকগণ যে কিরূপ

হইবে, কোন্ জাতীয় হইবে, অথবা উভয়জাতীয় হইলেও কোন্ জাতীয় কয়টা হইবে, এই সকল কিছুই তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না।

বর্ণ পরিবর্ত্তনে প্রজাপতি অক্ষম।

আর একজাতীয় প্রজাপতি আছে, তাহাদের ডানার উপর দিক্ শুষ্ক পত্রের ন্যায় ধূসর বর্ণের, কিন্তু নীচের দিকটা উজ্জ্বল নীলবর্ণে রঞ্জিত। এই বর্ণও পরিবৃত্তির নিয়মানুসারে সংগঠিত হইয়াছে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, এই বর্ণ কেন হইল, তবে নানা জনে আত্মরক্ষা প্রভৃতি নানা কারণ প্রদর্শন করিতে পারিবেন। কিন্তু এই বর্ণ কি উপায়ে হইল? এই উপায়ের বিষয় প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, কোনও সজ্ঞান ইচ্ছা কর্ত্তৃক এই রঞ্জিত হওয়া নিয়মিত হইতেছে। কারণ, বর্ণমাত্রই উৎপাদন করিতে গেলেই দৃষ্টিবিজ্ঞান বিশেষরূপ জানা আবশ্যক। যদি অতিরিক্ত সজ্ঞান শক্তি না স্বীকার করি, তবে স্বীকার করিতে হয় যে, যে দৃষ্টিবিজ্ঞানের অত্যল্পভাগও অনেক মনুষ্য জানে না, সেই বিদ্যা প্রজাপতি জানে, এবং তাহা জানিয়াই উক্ত প্রকার বর্ণ উৎপাদন করে। কিন্তু তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, একটি সামান্য প্রজাপতির ক্ষমতা বিশেষ ক্ষমতাপন্ন মনুষ্যের অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক, কারণ কোনও মনুষ্যই এ পর্য্যন্ত প্রজাপতির ডানাতে কোনও প্রকার বর্ণই উৎপাদন করিতে পারে নাই।

প্রাকৃতিক নিয়ম ব্যাকরণ শাস্ত্র।

এমন তো বলা যাইতে পারে যে, প্রাকৃতিক নিয়মই এই সমুদয় বর্ণ উৎপাদন প্রভৃতি কার্য্য করিতেছে। কিন্তু বাস্তবিক কি প্রাকৃতিক নিয়ম কোনও কার্য্য স্বয়ং করিতে পারে? আমি অগ্নিতে

জল দিলাম, অগ্নি নিবিয়া গেল। এই কার্য্যটি প্রাকৃতিক নিয়মের অনুযায়ী হইয়া সম্পন্ন হইল বটে, কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম কি অগ্নি নিবাইল, না আমি নিবাইলাম? প্রাকৃতিক নিয়ম সকলকে প্রাকৃতিক কার্য্যের ব্যাকরণশাস্ত্র বলিতে পারি। আগে যেমন ভাষা, তাহার পরে যেমন ব্যাকরণ; সেইরূপ প্রাকৃতিক ঘটনা আগে, তাহার পরে সেইগুলি নিয়মিতরূপে ঘটিতে দেখিলে, আমরা সেই ঘটনাসকলের কার্য্যকারণের মধ্যে একটি নিত্য সম্বন্ধ দেখিতে পাইয়া, সেই সম্বন্ধের নাম দিই "প্রাকৃতিক নিয়ম।' কিন্তু এই প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়ন্তা কে? কার্য্যকারণের মধ্যে এই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধের যোজয়িতা কে? পূর্ণশক্তি ইচ্ছাময় ব্রহ্ম ব্যতীত আর কাহাকে এই সকলের নিয়ন্তা বলিতে পারি? আমরা প্রাকৃতিক নিয়মের নিকটে যতই জিজ্ঞাসা করি না কেন যে, প্রাকৃতিক ঘটনাসকল কি উপায়ে হইতেছে, তাহার উত্তর প্রত্যাশা করা বৃথা। পরিবৃত্তিই বল, যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনই বল, আর অন্য যে কোন নিয়মের কথাই বল, কোনও নিয়মই বলিতে পারিবে না যে, অমুক প্রাকৃতিক ঘটনা কি উপায়ে হইল; সে এই মাত্র বলিতে পারিবে যে, উহা কেন হইতেছে, কি নিয়মের দ্বারা বদ্ধ রহিয়াছে। (১)

অভিব্যক্তিবাদের আর একটি প্রধান নিয়ম "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন" (২) (Survival of the fittest)।

---

(১) এক কথায় আমরা why জানিতে পারি, কিন্তু how জানিতে পারিব না।

(২) ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত অনুবাদ।

সৃষ্টির লক্ষ্য উন্নতি। 'এই নিয়মের কথা শুনিলেই মনে হয় যে, ইহা তো অতি সোজা কথা, যে যোগ্যতম হইবে, তাহারই জয় হইবে। কিন্তু সোজা কথা হইলেও এই বিষয়টি একটু বিবেচনার সহিত দেখিতে হইবে। যোগ্যতম বলিতে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ বুঝাইবে না। যোগ্যতম বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, চতুর্দ্দিকের অবস্থার পক্ষে অধিকতম উপযোগী। প্রাণি-বৃত্তান্ত বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, নানা-জাতীয় জীবজন্তু, যাহারা এক সময়ে অবস্থার উপযোগী হওয়াতে দলবলের সহিত পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছিল, পরে অবস্থা তাহাদের প্রতিকূল হওয়াতে তাহারা লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। আরও এইটুকু দেখিতে পাই যে, লুপ্তপ্রায় জীবজন্তুদিগের স্থানে যে সকল পরবর্ত্তী জন্তু আসিয়াছে, তাহারা লুপ্তপ্রায় জীবদিগের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে "উন্নত," এবং তাহাদিগের শারীরিক গঠন, মস্তিষ্কাদি, পূর্ব্ববর্ত্তী জীবদিগের অপেক্ষা কিছু অধিকতর আবর্ত্তিত (Complicated)। তবেই দেখা যাইতেছে যে, যোগ্য-তমের নিয়মটি স্বয়ং কোনও উদ্দেশ্য নহে। উদ্দেশ্য স্পষ্টই দেখা যাইতেছে উন্নতি; উক্ত নিয়মটি সেই উদ্দেশ্যসাধনের কার্য্যপ্রণালী-মাত্র, যন্ত্রমাত্র। পরিবৃত্তির নিয়মই বল, যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন নিয়মই বল, সেই সকলই দেখিতেছি, এক একটি বিভিন্ন কার্য্য-প্রণালীমাত্র। কিন্তু সৃষ্টির লক্ষ্য উন্নতি।

উন্নতিই ঈশ্বরের উদ্দেশ্য। এখন প্রশ্ন এই যে, কাহার উদ্দেশ্য জগতের উন্নতি? ঈশ্বরেরই উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার সৃষ্টিতে উন্নতির হিল্লোল অবিশ্রান্তভাবে বহিতে থাকিবে। যিনি সমুদয় বিশ্বজগতকে উন্নতির সহায় করিয়া দিয়াছেন; এমন কি, যিনি মৃত্যুকেও স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে

্য রাখিয়াছেন, সেই পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণশক্তি, পরব্রহ্ম ব্যতীত এই
.তির স্রোতে জগতে প্রবাহিত করিয়া দেওয়া, আর কাহাতে
হবিতে পারে? তিনি ভিন্ন আর কে এতটা ক্ষমতা ধারণ
রিতে পারে? এই উদ্দেশ্য যদি তাঁহারই না হইবে, তবে কি
তকগুলি অচেতন প্রাকৃতিক নিয়ম এই উন্নতির উদ্দেশ্যকে
পনা করিয়াছে? অচেতন কার্য্যপ্রণালীমাত্র কোনো মহান্
উদ্দেশ্যকে" স্থাপনা করিতে পারে—ইহা অপেক্ষা বাতুলতার
ধা আর কি হইতে পারে? আমি দূরে সংবাদ প্রেরণ করিব।
ই কারণে আমি কতকগুলি দণ্ড তাম্রতারে সংযুক্ত করিয়া
লাম এবং সেই তারের সহিত একটি বিশেষ যন্ত্র সংযুক্ত করি-
ম। এখন এই যন্ত্রটি বিশেষভাবে স্পর্শ করিলেই তাড়িতশক্তি
ৎপাদন করিয়া আমার অভিলষিত প্রদেশে প্রেরণ করে।
মারি রচিত কোনো বিশেষ সংকেত অনুসারে, এই তাড়িতশক্তি
রাই আমি তথায় সংবাদ প্রেরণ করিতে পারি। দূরে সংবাদ
রণ করিবার উদ্দেশ্য কি তাড়িতশক্তির, না আমার? আমিই
এই উদ্দেশ্যের মূল প্রবর্ত্তক নহি? এবং তাড়িতশক্তি কি
মার উদ্দেশ্যসাধনের এক বিশেষ নিয়মপ্রণালীমাত্র নহে?
ড়িৎশক্তির উদ্দেশ্য দূরে সংবাদ প্রেরণ করা, ইহা কত দূর
ঙ্গত কথা? উদ্দেশ্যমাত্রেরই পশ্চাতে এক সজ্ঞান পুরুষ
শ্যক। সেইরূপ এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে উন্নতি-উদ্দেশ্য
পনা কতকগুলি অচেতন নিয়ম-প্রণালীর দ্বারা কিছুতেই হইতে
রে না। অচেতন নিয়মের কথা দূরে থাক্, সচেতন সজ্ঞান
ষ্যই কি সকল সময়ে উন্নতিকে লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করে?
মরা যখন আহার করি, তখন কি আমরা ইহা মনে করিয়া
হার করি যে, ভবিষ্যতে ইহা দ্বারা আমার উন্নতি সাধিত

হইবে! আমাদের ক্ষুধা পায় বলিয়াই আমরা আহার করি; ক্ষুধার সময়ে আহার না করিয়া থাকিতে পারি না বলিয়াই আমরা আহার করি। ক্ষুধা আসিবার সময়ে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসে নাই। যে মঙ্গলবিধাতার আদেশে ক্ষুধা শরীরের মধ্যে আসিয়াছে, তিনিই জানেন যে, ইহা কেন আসিয়াছে, ইহা দ্বারা কি উন্নতি সাধিত হইবে। তবে আমরা তাঁহার উদ্দেশ্যের পরিচয় পাই, যখন দেখি যে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে গিয়া মনুষ্যের প্রয়োজনীয় নানা তত্ত্ব সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে; আহার করিয়া শরীরের বল-বৃদ্ধি হইতেছে, এবং সেই সঙ্গে মানসিক বল, আধ্যাত্মিক বল, সকলই বর্দ্ধিত হইতেছে।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল উন্নতিসাধনের প্রণালীমূলে ঈশ্বর।

এতক্ষণে আমরা স্পষ্ট বুঝিলাম যে, সেই চেতনের চেতন পরমেশ্বর জড়রাজ্যের অতীত থাকিয়া, প্রাণ-রাজ্যের অতীত থাকিয়া, সকলেরই অতীত থাকিয়া, সকলের দ্বারাই স্বীয় উদ্দেশ্য সংসাধিত করিয়া লইতেছেন। সেই উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার সৃষ্টিতে উন্নতি হউক। বিজ্ঞান যতই কেন তত্ত্ব আবিষ্কার করুক না, সে সকলই এই উদ্দেশ্যসাধনের নিয়মপ্রণালীমাত্র,—বিশেষ বিশেষ পথমাত্র। ইহাদের মূলে এক সজ্ঞান, শক্তিমান্ নিয়ন্তা না থাকিলে, ইহারা থাকিতেই পারে না। বিজ্ঞান যতই আলোচনা করা যায়, ততই সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত দেখিতে পাইয়া স্তম্ভিত হইতে থাকি। কে বলে যে, অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করিলে ঈশ্বরে বিশ্বাস দৃঢ়তর থাকে না? এমন কোনও কথা নাই যে, অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করিলেই ঈশ্বরে অবিশ্বাস আসিবে, অথবা, ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেই বিসৃষ্টিবাদ (Special creation) স্বীকার করিতে হইবে। জ্যোতির্ব্বিদ্যায় কেপলারের

সিদ্ধান্তই বল, পদার্থবিদ্যায় নিউটনের সিদ্ধান্তই বল, আর প্রাণি-তত্ত্বে ডার্বিনের সিদ্ধান্তই বল, সকল সিদ্ধান্তই সেই পূর্ণমঙ্গল পরব্রহ্মের মহিমাই কীর্ত্তন করিতেছে।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ প্রবন্ধে ভূলোকে ঈশ্বর নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়—ব্রহ্মতত্ত্বে নীতিবাদ।

এপর্য্যন্ত আমরা দেখিয়া আসিলাম যে, আমাদের আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্য যে, জ্ঞানময় পরমেশ্বরই এই জগতের নিয়ন্তা, সেই সত্যের সপক্ষে কারণবাদ ও প্রজ্ঞাবাদ একবাক্যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। কিন্তু এই কারণবাদ ও প্রজ্ঞাবাদ বহির্জগৎ হইতেই সাক্ষ্যের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া থাকে। এইবারে অপর দুইটি বিষয় নীতিবাদ ও শ্রদ্ধাবাদ আলোচনা করিবার কালে আমরা দেখিব যে অন্তর্জগৎ হইতেও অর্থাৎ আমাদের আত্মা হইতেও "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" পরম পিতামাতা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বিঘোষিত হইয়া থাকে।

আমরা যেমন আত্মার সহজজ্ঞান হইতেই ইচ্ছাময় ও জ্ঞানময় পরম পুরুষের অস্তিত্ব জানিতে পারি, সেইরূপ সহজজ্ঞান হইতেই পরম পুরুষ যে শুদ্ধ ও অপাপবিদ্ধ তাহাও জানিতে পারি। আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে আমরা পবিত্র থাকিবার, সুপথে চলিবার উপদেশ সর্ব্বদাই আত্মাতে অনুভব করি। এই সদসৎজ্ঞান এবং সৎকে গ্রহণ করিবার ও অসৎকে পরিত্যাগ করিবার প্রবৃত্তিই আমাদের আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্য অপাপবিদ্ধ পরমেশ্বরের অস্তিত্বে সাক্ষ্য দিতেছে।

আমাদের আত্মাতে যে নীতিজ্ঞান আছে, সেই নীতিজ্ঞান স্পষ্টই বলিয়া দিতেছে যে আমাদের অন্তরে সৎ ও অসৎ উভয় প্রকার প্রবৃত্তিই আছে। এই সদসৎ জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া আজি পর্য্যন্ত কোন সমাজ গঠিত হয় নাই, কোন ধর্ম্ম প্রচারিত হয় নাই। সকল ভাষায় "কর্ত্তব্য" একথার একটী গভীর আধ্যাত্মিক বল আছে। সদসৎ জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিলে মনুষ্যের মনুষ্যত্বই থাকে না। অধিক কি, এই সদসৎজ্ঞান থাকাতেই প্রত্যেক মনুষ্যেরই অন্তরে দায়িত্ব-জ্ঞান আছে। প্রত্যেক মনুষ্যই জানে যে তাহার সৎকর্ম্ম করিবার বিশেষ অধিকার আছে এবং অসৎকর্ম্ম করিলে তাহার জন্য শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। আত্মপ্রসাদ আসিয়া তাহাকে সৎকর্ম্মে উৎসাহিত করিতে থাকে এবং আত্মগ্লানি তাহাকে অসৎকর্ম্মের জন্য অতি কঠোর শাস্তি প্রদান করিতে থাকে। যখন কর্ত্তব্যজ্ঞান ধারণা করাইয়া দেয় যে অমুক কার্য্য করা উচিত, সে কার্য্য না করিলে অমনি আত্মগ্লানি আসিয়া আক্রমণ করে। এইরূপ দায়িত্বজ্ঞান থাকাতেই আমরা বুঝিতেছি যে নৈতিক নিয়ম বলিয়া পদার্থ আছে। দায়িত্বজ্ঞান যে কেবল মানসিক নহে, আমাদের যে প্রকৃত দায়িত্ব আছে এবং তাহা যে আমাদের আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ, তাহা ইতিহাস সপ্রমাণ করিয়া দেয়। সকল জাতির ইতিহাসেই দেখা যায় যে তাহাদের মধ্যে পুণ্যের পুরস্কর্ত্তা ও পাপের শাস্তিদাতা সম্বন্ধে এক প্রকার ধারণা আছেই। সুতরাং স্পষ্টই দেখিতেছি যে দায়িত্বজ্ঞানের মূল নৈতিক নিয়মের অস্তিত্ব মানবমাত্রেই আছে, তবে ইহার উৎপত্তি লইয়া দার্শনিকগণ যতই কেন বিচার করুন না, তাহাতে তাহার অস্তিত্ব লোপ হইতেছে না।

নীতিজ্ঞান স্বার্থপরতার রূপান্তর নহে।

দার্শনিকদিগের কেহ কেহ নৈতিক নিয়মের উৎপত্তি বিচার করিতে গিয়া তাহার অস্তিত্বও লোপ করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকেন। তাঁহারা নীতিজ্ঞানকে বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে ইহা স্বার্থপরতার অভিব্যক্তি মাত্র। মানবজাতি বন্য অবস্থায় নীতিজ্ঞান-পরিশূন্য হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিত; কিন্তু ক্রমে যখন তাহারা দেখিল যে কতকগুলি কার্য্য সমাজের পক্ষে উপকারী, তখন তাহারা ক্রমে সেই কার্য্য-গুলিকে কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিল এবং যে গুলি তদ্বিপরীত, সেইগুলি ক্রমে অন্যায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। ক্রমে বংশপরম্পরায় এই দুই ভাব চলিয়া আসিতে আসিতে মনুষ্যের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া পড়িল। এইরূপ স্থূল দৃষ্টিতে দেখিয়া তাঁহারা সমগ্র নীতিজ্ঞানকে একবিধ স্বার্থপরতারই রূপান্তর মাত্র বলিতে চাহেন। ইঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে চাহি যে, যে কোন ভাবের বা যে কোন পদার্থের গুণাবলীকে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাদের এক একটীকে সরাইয়া লইলে সেই ভাবের ভাবত্ব বা সেই পদার্থের পদার্থত্ব থাকে কি না। পদ্মপুষ্পের গুণাবলী বিশ্লেষণ করিয়া তাহার সুরভিত্ব, তাহার মসৃণত্ব প্রভৃতি গুণ সকল একে একে সরাইয়া লও, দেখিবে পদ্মপুষ্পের আর কিছুই থাকে না। কিন্তু আমাদের সেইরূপ সরাইবার ক্ষমতা নাই। আমরা জানিতে পারি বটে যে পদ্মপুষ্পে এই এই গুণ আছে, কিন্তু তৎসঙ্গে ইহাও জানি যে এই সকল গুণ পদ্মপুষ্পেরই। সেইরূপ নীতিজ্ঞানকেও বিশ্লেষণ করিয়া তাহার এক একটী গুণকে সরাইয়া লইতে পারি না। আমরা জানিতেছি যে সেই সকল গুণ নীতিজ্ঞানের সহিতই সম্বদ্ধ আছে। আমরা জানি যে নীতিজ্ঞান, নৈতিক নিয়ম সকল জগতে কার্য্য করিতেছে বলিয়াই জগতের মঙ্গল

হইতেছে, কিন্তু তাই বলিয়া নৈতিক নিয়মগুলি ব্যক্তিগতই হউক বা সমাজগতই হউক স্বার্থপরতা হইতে উৎপন্ন তাহা বলিতে পারি না যখন পাপাচরণ গোপনে করিলেও লজ্জা ও আত্মগ্লানি আমাদিগকে গুরুতর আঘাত করিতে থাকে; আমি আমার সমাজের লোকের ক্ষতিকর কার্য্য করিয়াছি বলিয়া যে সেই আত্মগ্লানি আসিয়াছিল, তাহা নহে। সে ভাব সর্ব্বপ্রকার স্বার্থপর ভাবের অতীত। যখন কর্ত্তব্যের পথ অনুসরণ করিয়া হৃদয় মহান্ উন্নতভাব প্রাপ্ত হয়, সে ভাব এক, আর আমার সঙ্গীরা ভাল বলিবে. সেই অনুসারে কার্য্য করিবার ভাব আর এক— উভয় ভাবের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। যে বীর সন্তোষের সহিত আপনার সমুদয় পার্থিব সুখসম্পদ্ বিসর্জ্জন দিয়াও কর্ত্তব্য পালন করেন, সে বীরের কর্ত্তব্যপালনে উৎসাহ কি মনুষ্যের কথা হইতে আসে? রোমীয় রঙ্গভূমিতে মনুষ্য-হত্যার নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া কর্ত্তব্যবোধে যে সাধু রঙ্গস্থলে ঝম্প প্রদান করিয়া আত্মবিসর্জ্জন দিলেন এবং যাঁহার পুণ্যবলে ক্রীড়ায় মনুষ্য-হত্যা উঠিয়া গেল, সেই সাধু পুরুষের বল কি নিষ্ঠুর মনুষ্যদিগের কথার উপর নির্ভর করিয়াছিল? এরূপ মনে করা কেবল বাতুলতা মাত্র। নীতিজ্ঞান একমাত্র পরমেশ্বর ব্যতীত আর কেহই আমাদের আত্মাতে রোপণ করিয়া দেন নাই। চর্চ্চা ও অভিজ্ঞতা নীতিজ্ঞানকে সম্যক্ পরিস্ফুট করিতে পারে, কিন্তু নীতিজ্ঞানের বীজ না থাকিলে পরিস্ফুট হইবে কি? চর্চ্চা এবং অভিজ্ঞতা নীতিজ্ঞানেরই বল বা অন্য কোন জ্ঞানেরই বল, কিছুরই বীজ সৃষ্টি করিতে পারে না। সুপ্রসিদ্ধ অভিব্যক্তিবাদী ওয়ালেস তাঁহার পুস্তকে (Natural selection) এই সত্য সমর্থন করিয়া পরে বলিতেছেন 'Although the *practice* of benevolence,

honesty or truth, may have been useful to the tribe possessing those virtues, that does not at all account for the peculiar *sanctity*, attached to actions which each tribe considers right and moral, as contrasted with the very different feelings with which they regard what is merely *useful*." (P. 352).

দায়িত্বজ্ঞানে ঈশ্বরের পরিচয়।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে দায়িত্বজ্ঞান নৈতিক নিয়মের অস্তিত্ব প্রকাশ করে। এইবারে দেখিব যে এই দায়িত্বজ্ঞান ঈশ্বরেরও অস্তিত্ববিষয়ে সহজ-জ্ঞানকে বিশেষ সমর্থন করে। আমাদিগের দায়িত্ব সজ্ঞান পুরুষেরই নিকটে সম্ভবে। অজ্ঞান জড়পদার্থের নিকটে সম্ভবে না। প্রাকৃতিক নিয়মের নিকট আমাদের যে দায়িত্বের কথা বলি, তাহা কেবল কথার অলঙ্কারমাত্র। অমনো-যোগিতা বশতঃ আমি অগ্নির উপরে হস্ত রক্ষা করিলাম, আমার হাত পুড়িয়া গেল এবং তজ্জন্য আমাকে যন্ত্রণাও সহ্য করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া আমি অগ্নির নিকটে নৈতিক অপরাধে অপরাধী রহিলাম না। আমি একটী বৃক্ষ কাটিলাম, আমি তাহার নিকট কোন নৈতিক অপরাধে অপরাধী হইলাম না। নৈতিক সম্বন্ধ সজ্ঞান পুরুষদিগেরই মধ্যে সম্ভবে।

এখন কথা এই যে আমি নৈতিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ বটে, কিন্তু কাহার সহিত সম্বদ্ধ? আমার সহিত আমার সম্বন্ধ থাকা ও না থাকা উভয়ই সমান; যেমন আপনার নিকট আপনি ঋণী থাকা না থাকা উভয়ই সমান। আমি আপনার নিকট ঋণ লইলেও দরিদ্র হইব না এবং ঋণ পরিশোধ করিলেও বেশী ধনী হইব না। আমার সহিত আমার নৈতিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ থাকা কেবল বৃথা জল্পনামাত্র। অপর মনুষ্যের সহিত আমার প্রকৃত

সম্বন্ধ থাকুক বটে, কিন্তু তাহাও সঙ্কীর্ণ সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধ উভয়ের পরস্পরের সম্মতিক্রমে ঘটিয়া থাকে। যে সর্ত্তে সম্মতি প্রদত্ত হয়, সেই সর্ত্তের কেহ ব্যতিক্রম করিলেই সে জানিতে পারে যে অপর ব্যক্তির তাহার বিরুদ্ধে বলিবার এবং তাহার নিকট হইতে উপযুক্ত মূল্য চাহিবার অধিকার আছে। কিন্তু এই দায়িত্বজ্ঞানও আমাদের পরস্পরের ইচ্ছাক্রমে স্বকৃত সম্বন্ধের উপরেই নির্ভর করে। আমাদের প্রকৃত দায়িত্ব মনুষ্যের সহিত স্বকৃত সম্বন্ধের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই বদ্ধ থাকে না। স্বকৃত সম্বন্ধ রহিত হইলেও আমাদের দায়িত্বভাব বিলুপ্ত হয় না। আমি কোন বন্ধুর সহিত সর্ত্ত করিলাম যে যদি তাঁহার সহিত বিশ্বাসঘাতকের আচরণ করি, তবে তাঁহাকে তাহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এত মুদ্রা ধরিয়া দিব। আমি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ স্বীকৃত মুদ্রা প্রদান করিলেও, সুতরাং তাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ রহিত হইলেও, আমি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেই দায়িত্ব-বিচ্ছিন্ন হইব না। ইহা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কেবলই অন্তরে সজোরে আঘাত করিবে ও বলিতে থাকিবে যে আমি অন্যায় করিয়াছি। অতএব দেখিতেছি যে অপর মনুষ্যের সহিত স্বকৃত সম্বন্ধ রহিত হইলেও দায়িত্ব বিলুপ্ত হয় না—দায়িত্বের এক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে। এই দায়িত্ব যে নৈতিক নিয়মের অস্তিত্ব প্রকাশ করে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এবং এই দায়িত্ব যখন মিথ্যা পদার্থ নহে, সত্য পদার্থ, তখন নৈতিক নিয়মও সত্য পদার্থ;— সত্য সত্যকেই প্রকাশ করে। কিন্তু এই নৈতিক নিয়মের বল আইসে কোথা হইতে? এই প্রশ্নের উত্তর একমাত্র আত্মপ্রত্যয় দিতে পারে; আত্মপ্রত্যয় বলে যে এই অপার্থিব বল সেই জ্ঞানময় ন্যায়বান্ পরাৎপর ত্রিভুবনপালকের নিকট হইতেই আসিয়াছে

আমরা এখন দেবভাষায় সেই পরমদেবের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া পূর্ণহস্তে গৃহে প্রত্যাগমন করি।

"হংসাঃ শুক্লীকৃতা যেন শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ।
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স দেবস্ত্বাং প্রসীদতু" ॥

যিনি হংসসকলকে শুক্লপক্ষে ভূষিত করিয়া দিয়াছেন, যিনি কপোতীদিগকে হরিদ্বর্ণের আচ্ছাদন দিয়াছেন, এবং যিনি ময়ূরসকলকে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন, সেই দেবদেব পরমদেব আমাদের প্রত্যেকের উপর প্রসন্ন হইয়া আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ প্রবন্ধে উপসংহার অধ্যায় সমাপ্ত।